৯৫-৯৬ দুই খণ্ড একত্রে
বাংলাপিডিএফ
ক্যারিলং ও দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ
রুমি

দস্যু বনহুর সিরিজ

দুই খণ্ড একত্রে

ক্যারিলং ও দস্যু বনহুর-৯৫
মুখোশের অন্তরালে-৯৬

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

মিঃ লোদী এবং মিস লুনা দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়ে তাকালেন জলতরঙ্গের দিকে। জুব্‌রার স্রোতধাবা কল কল ছল ছল করে এগিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে ভেসে চলেছে দু'টি কালো মত কিছু।

মিঃ লোদী বলে উঠলেন—বস্তু দু'টি কি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে নিশ্চয়ই জলজীব নয়, অন্যকিছু হবে.........

মিস লুনাও বললো—হাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

মিস লুনার হাত থেকে দূরবীক্ষণ নিয়ে বনহুর চোখে লাগালো।

ভালভাবে লক্ষ্য করে বনহুর বললো—ঐ বস্তু দু'টি তুলে নেওয়া দরকার, কারণ ও দু'টি কি তা আমাদের জানার প্রয়োজন আছে।

হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ ম্যারোলিন। মিঃ লোদী কথাটা বলে ষ্টীমারখানাকে ঐ বস্তু দুটিকে ষ্টীমারে তুলতে নির্দেশ দিলেন।

উচ্ছল স্রোতধারায় সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে বস্তু দু'টি।

বস্তু দু'টিকে ধেয়ে চলেছে ষ্টীমারখানা।

অল্পক্ষণেই জমকালো বস্তু দু'টির নিকটে পৌঁছে গেলো ষ্টীমারখানা।

বনহুর এবং অন্য সকলে লক্ষ্য করলো বস্তু দু'টি একটা ভাসমান তক্তার উপর রয়েছে। অবশ্য তক্তাটা পানির তলায় কিছু অংশ তলিয়ে থাকায় এতক্ষণ কারও দৃষ্টিতে স্পষ্ট ধরা পড়েনি।

মিঃ লোদীর সহকারী বললেন—বস্তু দু'টি মানুষের দেহ নয়, নিশ্চয়ই কোনো জলজন্তু বা জলজীব হবে।

মিঃ কিবরিয়া এতক্ষণ নিশ্চুপ লক্ষ্য করছিলেন, তিনি বললেন—বস্তু দু'টি জলজন্তু বা জলজীব নয়, কোনো বিস্ময়কর বস্তু হবে।

বিভিন্ন রকম উক্তি চললো বস্তু দু'টি নিয়ে। কিন্তু আসলে বস্তু দু'টি কি তা জানা গেলো না, যতক্ষণ না বস্তু দু'টি ষ্টীমারে তুলে নেওয়া হলো।

তবে কিছুক্ষণেই বস্তু দু'টিকে ষ্টীমারে তুলে নেওয়া সম্ভব হলো। অবাক হলো সবাই—বস্তু দু'টি কোনো জলজীব বা জলজন্তু নয়, আসলে মানুষ—তাদের দেহে ডুবুরির পোশাক।

ষ্টীমার বস্তু দু'টিকে তুলে নেবার পর সবাই বিস্মিত হলো আর বনহুর হলো চিন্তিত, সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে গেলো। অনুমানেই বনহুর বুঝতে পেরেছে বস্তু দু'টি সংজ্ঞাহীন কায়েস এবং রহমান। তাড়াতাড়ি ওদের দেহ থেকে ডুবুরির পোশাক ও অক্সিজেন ভরা মুখোশ খুলে ফেললো।

মিঃ লোদী বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—মিঃ ম্যারোলিন, আপনি কি এই ব্যক্তিদ্বয়কে চেনেন?

বললো বনহুর—হাঁ, এরা আমার লোক। ডুবুজাহাজটার ধ্বংস ব্যাপারে মিস লুনা যেমন আমাকে সহায়তা করেছে, তেমনি করেছে এরা। কথাগুলো বলে রহমান এবং কায়েসকে পরীক্ষা করে দেখলো বনহুর।

মিঃ লোদী জিজ্ঞাসা করলেন—এরা জীবিত না মৃত?

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—এখনও জীবিত আছে কিন্তু ঠিকমত চিকিৎসা না পেলে হয়তো এরা মৃত্যুবরণ করবে।

মিস লুনা বলে উঠলো—মিঃ ম্যারোলিন, এই স্টীমারে চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে। মিঃ লোদী ডাক্তার এবং ওষুধপত্র নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি সহযোগিতা করেছেন। কাজেই আপনার সহকারীদের চিকিৎসার কোনো অসুবিধা হবে না।

মিঃ কিবরিয়াকে বললেন মিঃ লোদী—আপনি যান এবং দ্রুত ডাক্তার ও ওষুধপত্র নিয়ে আসুন।

মিঃ লোদী নির্দেশ পেয়ে মিঃ কিবরিয়া তাড়াতাড়ি স্টীমারের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার ও ওষুধপত্র সহ নেমে এলেন।

ডাক্তার রোগীদের পরীক্ষা করে বললেন—না, ভয়ের তেমন কারণ নেই অত্যন্ত ঠাণ্ডায় এবং প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের বেগে এরা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে।

চিকিৎসা শুরু হলো।

বনহুরের সেই অদ্ভুত জলযানটাকে তাঁরা স্টীমারের সঙ্গে আটকে নিলেন, তারপর তাঁরা যাত্রা করলেন নিজ দেশের উদ্দেশ্যে।

কান্দাই ছেড়ে বহুদূর তারা এসে পড়েছিলো।

মিঃ লোদীর আনন্দ যেন ধরছে না, তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে কথা-বার্তা বলছিলেন। কারণ জুব্‌রা বাঁধ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার পর দেশের এক মর্মস্পর্শী অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। দেশবাসীর মনের আনন্দ উবে গেছে কর্পূরের মত। কারণ জুব্‌রার তীরস্থ দুঃস্থ জনগণের করুণ মর্মবিদারক পরিণতি সবাইকে ব্যথিত করে তুলেছে। পুলিশমহল নিপুণভাবে তদন্ত চালিয়ে আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছে যে, বিদেশী চক্রান্তেই দেশের এই সর্বনাশ সংঘটিত হচ্ছে। শুধু জুব্‌রার বাঁধই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় নি, কান্দাইয়ের মহামূল্যবান বহু প্রতিষ্ঠান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বহু কলকারখানা, বহু ধনসম্পত্তি বি[illegible] হয়েছে এই চক্রান্তকারীদের কুচক্রে।

পুলিশমহল যখন বিদেশী চক্রান্তকারীদের সন্ধান করে ফিরছিলেন তখন মিস লুনাই গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে কুচক্রী দলে এবং তাদের সন্ধান নিয়ে জানায় পুলিশমহলকে। কিন্তু পুলিশমহল তাকে প্রথমে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি। যখন মিঃ ম্যারোলিনের ছদ্মবেশে স্বয়ং দস্যু বনহুর ডুবুজাহাজে

কাজ করছিল্লো, তখন ওয়্যারলেসে সবকিছু জানাচ্ছিলো মিস লুনা। সে গোপনে ঐ জাহাজেই অবস্থান করছিলো ও লক্ষ্য করছিলো বনহুরের কার্যকলাপ। এ ছাড়া যখন যে ঘটনা ঘটেছে সব সে ওয়্যারলেসে জানাচ্ছিলো পুলিশমহলে।

যখন বনহুর ডুবুজাহাজখানাকে ধ্বংস করার অভিপ্রায় নিয়ে সংগ্রাম চালাচ্ছিলো তখন মিস লুনা একদিন আলগোছে সরে পড়েছিলো ডুবুজাহাজ থেকে, কারণ সে বুঝতে পেরেছিলো আর বিলম্ব করা উচিত হবে না, দস্যু বনহুর নিশ্চয়ই সুযোগ বুঝে ডুবুজাহাজধ্বংসী মেইন সুইচ টিপবে, তখন তাকে রক্ষার প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং সেজন্যই লুনা সরে এসেছিলো ডুবুজাহাজ থেকে।

এক সময় মিস লুনা সব কথা পুলিশমহল এবং বনহুরের কাছে ব্যক্ত করলো। মিস লুনার মুখে তার বিস্ময়কর কাহিনী শুনে সবাই আশ্চর্য হলেন। অন্তরে অন্তরে বনহুর ধন্যবাদ জানালো মিস লুনাকে।

আর পুলিশমহল ধন্যবাদ জানালেন দস্যু বনহুরকে, কারণ এই শয়তান কুচক্রীদলকে সায়েস্তা করার সাধ্য ছিলো না কারও। দেশের বুকে অবিরত ধ্বংসাত্মক কাজ চলেছে কিন্তু এসব কাজ কারা করছে এবং কোথা থেকে সংঘটিত হচ্ছে, এরও কোনো হদিস খুঁজে পাওয়া যায় নি। এবার তার সমাপ্তি ঘটেছে।

কিন্তু শয়তান ক্যারিলং কে এবং কোথায় থাকে সে...। বনহুর ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো।

মিঃ লুনা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় বললেন মিঃ লোদী —আমাদের মনে হয় এসব দস্যু বনহুরের কাজ। তার অসাধ্য কিছু নেই, কাজেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে......

বনহুর তখন নিজ দেহ থেকে অদ্ভুত ডুবুরি পোশাক খুলে ফেলছিলো। মিঃ লোদীর কথায় তাকালো সে মিস লুনার মুখের দিকে।

মিঃ লুনা তখন তাকিয়ে ছিলো বনহুরের দিকে। এখানে একমাত্র সেই জানে তার আসল পরিচয়।

পরদিন রহমান ও কায়েস সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। তাদের সুচিকিৎসা এবং সেবাযত্নের কোনো ত্রুটি ছিলো না। তাই তারা এত দ্রুত সেরে উঠলো।

ধীরে ধীরে স্মরণ হলো তাদের সব কথা, সেই অদ্ভুত ডুবুজাহাজের লৌহ-লিফ্‌টের বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভ করে তারা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলো বলেই তারা এখন সূর্যের আলো দেখার সৌভাগ্য লাভ

কাটালো। অবশ্য ডুবুরা নদের গভীর অতলে মৃত্যুর সঙ্গে তারা লড়াই করেছে কিন্তু তবুও সজ্ঞান থাকতে সক্ষম হয়নি তারা।

তাদের কানে এখনও সেই ভয়ঙ্কর শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সেকি ভীষণ শব্দ! তাদের কান দুটোকে যেন চিরদিনের জন্য তালাবদ্ধ করে দিয়েছে।

রহমান এবং কায়েস পাশাপাশি দুটো বেডে শুয়ে ছিলো। তারা এখন সুস্থ কিন্তু দুর্বল, বেশিক্ষণ কথা বলতে পারে না, তাই নীরবে চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে আছে।

বনহুর ওদিকের মুক্ত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। দৃষ্টি তার সীমাহীন আকাশের দিকে সীমাবদ্ধ। ভাবছে নতুন কোনো কথা। মিসেস এলিনার মুখখানা মনে পড়ছে তার—শুধু নরপিশাচীই নয়, সে একটা জীবন্ত শয়তানী ছিলো। ভ্রু-জোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠলো তার।

❑

আরও দু'দিন কেটে গেলো। রহমান এবং কায়েস এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। একই ক্যাবিনে বনহুর, রহমান ও কায়েস শয়ন করে।

পাশের ক্যাবিনে পুলিশ অফিসারগণ। তৃতীয় ক্যাবিনে মিস লুনা।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো বনহুরের। সে সজাগ হয়ে কান পাতলো এবং দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সম্মুখের দিকে। একটি ছায়া যেন সরে গেলো ক্যাবিনের দরজার পাশ থেকে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে বিছানায় উঠে বসলো এবং সতর্কভাবে আলগোছে বেরিয়ে এলো ক্যাবিনের বাইরে। ভালভাবে লক্ষ্য করতেই দেখলো একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। বনহুর ছায়ামূর্তিটাকে অনুসরণ করে এগুতে লাগলো। কিন্তু কে এই ব্যক্তি যে তার ক্যাবিনের দরজায় গিয়ে পুনরায় ফিরে যাচ্ছে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এলেছিলো তাই বা কে জানে!

ছায়াটা একটু এগিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বনহুর এসে সেই স্থানে দাঁড়ালো, একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে সেখানে। চারিদিকে জমাট অন্ধকার হলেও সবকিছু নজরে পড়ছিলো, বনহুর দেখতে পেলো স্টীমারের মেঝেতে এক জায়গায় গোলাকার ছিদ্রপথ। যে কোনো ব্যক্তি নির্বিঘ্নে সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করতে পারবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর বুঝতে পারলো ছায়ামূর্তি যেই হোক সে নিশ্চয়ই ঐ পথে স্টীমারের খোলসে প্রবেশ করেছে তাতে কোনো ভুল নেই। বনহুর বিলম্ব না করে সে ঐ ছিদ্রপথে ভিতরে প্রবেশ করলো।

একটি সিঁড়িপথ সোজা নেমে গেছে নিচের দিকে।

বনহুর সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে চললো। বেশিদূর তাকে অগ্রসর হতে হলো না, একটা দরজার মত কিছু সম্মুখে বাধার সৃষ্টি করলো। মৃদু চাপ দিতেই দরজা সরে গেলো একপাশে, ভিতরে আরও একটা সিঁড়িপথ।

সেই সিঁড়ির ধাপে পা দিতেই সিঁড়িটা আপনা আপনি সা সা করে কিছুটা নেমে গেলো নিচে। আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে দেখলো বনহুর, সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটা ক্যাবিন। বিস্ময়কর বটে। বনহুর তাকিয়ে দেখলো, সে নিজে দাঁড়িয়ে আছে স্টীমারের তলদেশের মেঝেতে।

হঠাৎ কাঁধে হাত রাখলো কেউ যেন।

বনহুর চমকে না উঠলেও একটু হকচকিয়ে গেলো, ধীরে ধীরে মাথাটা ফিরিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখলো মিস লুনা মৃদু মৃদু হাসছে। বললো সে—খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তাই না?

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আশ্চর্য না হয়ে পারি! হঠাৎ এভাবে.........

প্রয়োজন ছিলো, তাই......

তাই এত রাতে?

হাঁ।

ওদিকে এগিয়ে গিয়ে সুইচ টিপলো মিস লুনা, অমনি ক্যাবিনে আলো জ্বলে উঠলো।

উজ্জ্বল আলোকে চারিদিকে স্পষ্ট নজরে পড়লো বনহুরের।

মিস লুনাকে আজ আরও সুন্দর লাগছে। নিষ্পলক চোখে বনহুর তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ ওর দিকে।

মিস লুনা বললো—কি দেখছেন বলুন তো?

আপনাকে! একটু থেমে বললো বনহুর—সত্যি মিস লুনা, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু......

বলুন, থামলেন কেন?

কিন্তু আপনার আসল রূপ আজও আমার কাছে ধরা পড়েনি। আপনি এক বিস্ময়কর নারী......

তার চেয়ে আপনি আরও বেশি আশ্চর্যজনক ব্যক্তি। যা অসাধ্য, যা কেউ পারে না তা আপনি পারেন। মিসেস এলিনার ডুবুজাহাজসহ তাকে আপনি ধ্বংস করেছেন, এটা কম বিস্ময়কর নয়।

মিস লুনা, আপনার সহায়তাই আমাকে এ ব্যাপারে জয়ী করেছে।

বনহুর, আমি তোমার আসল পরিচয় জানি আর জানি বলেই তোমাকে শ্রদ্ধা করি। শুধু শ্রদ্ধাই করি না, ভালবাসি......

মিস লুনা!

হাঁ বনহুর, তুমিই একমাত্র পুরুষ যার তুলনা হয় না।

মিস লুনা, এটা প্রেমাভিনয়ের সময় নয়, বলুন আপনি কেন অসময়ে আমার ক্যাবিনের পাশে গিয়েছিলেন? বলুন কি আপনার উদ্দেশ্য?

মিস লুনা মাথাটা নিচু করে নিলো, কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর পুনরায় বললো—চুপ করে রইলেন কেন, বলুন?

মিস লুনা চোখ তুলে তাকালো, তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো এক মায়াময় চাহনি; বললো সে—বনহুর, আমি চিরদিন অভিনয়ই করে এসেছি কিন্তু সত্যিকারের ভাল আমি কাউকে কোনোদিন বাসিনি। আমি তোমাকে অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি বনহুর। শুধু এই কথা বলার জন্যই কি আপনি আমার ক্যাবিনের পাশে গিয়েছিলেন?

যদি বলি হাঁ।

মিস লুনা, আপনি ভুল করছেন, কারণ নারীকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি কিন্তু তার প্রতি কোনো মোহ আমার নেই। একটু থেমে বললো বনহুর—আমাদের সম্মুখে এখনও বিরাট কর্তব্য রয়েছে। যদিও আমরা বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরাট একটা ধ্বংসমুখী প্ল্যানকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছি তবু আরও কাজ বাকি আছে যা করতে হলে আপনার সহায়তা আমার একান্ত কাম্য......থামলো বনহুর।

মিস লুনা নতমুখে দাঁড়িয়ে ছিলো, এবার সে চোখ তুলে চাইলো বনহুরের মুখের দিকে।

বললো বনহুর—মিস লুনা, আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না, কারণ আমি এখন সম্পূর্ণ আপনার উপর ভরসা রাখি। আপনার সাহায্য আমাকে এই বিরাট সাফল্য এনে দিয়েছে। বনহুর মিস লুনার কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিলো।

লুনা নির্বাক, সে বিস্ময় তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। ধীর শান্ত কণ্ঠে বললো সে—আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে সর্বক্ষণ সহায়তা করবো।

বনহুরের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সে ডান হাতে ওর চিবুকটা তুলে ধরে বললো—ধন্যবাদ মিস লুনা, ধন্যবাদ। তারপর বনহুর ফিরে এলো নিজ ক্যাবিনে।

বনহুর যখন ছায়ামূর্তিটাকে অনুসরণ করে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেলো তখন রহমান নিশ্চুপ ছিলো না বা নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে ছিলো না। সে আলগোছে

অনুসরণ করেছিলো তার সর্দারকে। রহমান জানতো, এ স্টীমারে সদাসতর্ক দৃষ্টি রয়েছে পুলিশমহলের। হয়তো এটা পুলিশদের কারসাজি হবে। সে ছায়ামূর্তিটাকেও লক্ষ্য করেছিলো আর সে কারণেই রহমান চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। সর্দার যখন শয্যা ত্যাগ করে ক্যাবিনের বাইরে চলে গেলো তখন রহমানও বেরিয়ে এলো রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ক্যাবিনের বাইরে।

লক্ষ্য করলো সর্দার ছায়াটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে, কে ঐ ছায়ামূর্তি কিছুই জানে না সে। তবু রহমান ফিরে এলো না, সেও সর্দারকে অনুসরণ করে চললো এবং একসময় যেখানে সর্দার ছিলো ঠিক তার কাছাকাছি পৌছে গেলো।

আড়ালে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করতে লাগলো, যদি সর্দার কোনো বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে রহমান নিশ্চুপ থাকবে না, থাকতে পারে না। সেইজন্য রহমান প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সব সে নিজ কানে শুনলো।

ছায়ামূর্তি নারী এটা সে বুঝতে পারলো তার কণ্ঠস্বরে। এবং সে যে মিস লুনা তাও জানতে বাকি রইলো না। রহমান জানে, তার সর্দারকে যে নারীই দেখেছে সেই আকৃষ্ট হয়েছে-মিস লুনাই বা কেন বাদ যাবে! রহমান ফিরে এসেছে তার শয্যায়। তাদের সর্দারকে আকৃষ্ট করতে পারবে না কোনো রানী, এ বিশ্বাস তার অটুট আছে।

রহমান শয্যায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো ঐ কথাই। তাদের সর্দার সত্যি এক বিস্ময়কর পুরুষ। তার চরিত্র অসাধারণ। নারীর রূপযৌবন তাকে অভিভূত করতে পারে না কোনোদিন। রহমানের হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরে উঠে, নত হয় তার মাথাটা।

❑

ফিরে এলো তারা পুলিশপ্রধান ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার সহ কান্দাই শহরের ইলার অঞ্চলে। মিস লুনা বনহুরকে তার বাসভবনে আহ্বান জানালো। বললো—আমার বাসভনে দু'দিন থাকার পর আপনার ছুটি।

হাসলো বনহুর, বললো—উপায়হীন আমি, কারণ আমাকে আজই যেমন করে হোক ফিরে যেতে হবে আমার বাসস্থানে। মিস লুনা, ক্যারিলংকে খুঁজে বের করতে হবে, তার পূর্বে আছে কিছু কাজ যা আমাকে সমাধা করতে হবে সবার অলক্ষ্যে।

শেষ পর্যন্ত মিস লুনা বনহুরকে বিদায় দিতে বাধ্য হলো।

মিস লুনা বনহুরকে বিদায় দিবার জন্য যখন তার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিলো তখন হঠাৎ বনহুর এবং মিস লুনার দৃষ্টি পড়লো সিড়ির মুখে। একদল সশস্ত্র পুলিশ সহ পুলিশপ্রধান মিঃ লোদী দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। মিঃ লোদীর চোখেমুখে একটা ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠেছে।

মিস লুনা এবং বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বনহুর চাপাকণ্ঠে বললো—মিস লুনা, পুলিশমহল আমার পরিচয় জেনে নিয়েছে!

মিস লুনার কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে, দু'চোখে উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে। ঢোক গিলে তাকালো সে পুলিশপ্রধানের মুখের দিকে।

মিঃ লোদী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—খবরদার, এক পা নিচে নামতে চেষ্টা করবে না।

প্রতিটি পুলিশ তাদের হস্তস্থিত অস্ত্র বাগিয়ে ধরেছে বনহুরের বুক লক্ষ্য করে।

এবার মিঃ লোদী বললেন—নেমে আসো নিচে কিন্তু হাত দু'খানা মাথার উপর উঁচু করে ধরো, নইলে গুলী ছুড়তে বাধ্য হবো।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, সিড়ির অদূরে গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে দু'টি পুলিশ ভ্যান। মিঃ লোদীর চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলছে। অন্যান্য পুলিশ যারা অস্ত্র বাগিয়ে ধরে আছে তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বনহুর এবার নামতে শুরু করলো। মিস লুনা অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বনহুর প্রায় সিড়ির মাঝামাঝি এসেছে ঠিক সেই মুহূর্তে পিছনে একটা প্রচন্ড শব্দ হলো।

একসঙ্গে ফিরে তাকালো সবাই।

ধূয়ায় ভরে উঠলো চারদিক।

পুলিশবাহিনী এবং পুলিশপ্রধান চোখে অন্ধকার দেখলেন, তাঁরা বুঝতে পারলেন কাঁদানে গ্যাস ছাড়া হয়েছে কিন্তু কে এই গ্যাস ছাড়লো? বনহুর তো তাদের সম্মুখে দন্ডায়মান। দু'হাতে চোখমুখ ঢেকে ফেললেন পুলিশপ্রধান, তাঁর হাত থেকে রিভলভার খসে পড়লো।

পুলিশ বাহিনী কে কোন্ দিকে দৌড় দিলো।

ধূয়া কমে এলে পুলিশপ্রধান এবং পুলিশবাহিনী দেখলো সিঁড়ি শূন্য—বনহুর নেই।

মিস লুনাও অবাক হয়ে গেছে।

হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটবে এ জন্য প্রস্তুত ছিলো না মিস লুনা। পুলিশপ্রধান নিজে মিঃ ম্যারোলিন ও তাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন সসম্মানে। তারপর মাত্র কয়েক ঘন্টা কেটেছে, এরই মধ্যে কি করেই বা জানতে পারলেন মিঃ ম্যারোলিনের আসল পরিচয়!

কাঁদানে গ্যাসের তীব্রতা ক্রমে কমে আসে।

মিঃ লোদী রুমালে চোখমুখ মুছতে মুছতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

অন্যান্য পুলিশ অফিসারও তাঁদের অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে সিঁড়ির চারপাশ ঘিরে ধরেন।

কিন্তু মিঃ ম্যারোলিন কোথায়?

মিঃ লুনার বাড়িখানা ঘেরাও করে ফেলা হলো। মিঃ লোদী মিস লুনাকে আটক করার নির্দেশ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মিস লুনাকে পুলিশ ঘিরে ফেললো। অফিসাররা তাঁর বাড়ির অভ্যন্তরে তল্লাশি চালালেন।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেলো না মিঃ ম্যারোলিনকে। শেষ অবধি মিস লুনাকেই আটক করে নিয়ে ফিরে চললেন পুলিশ বাহিনী।

যখন পুলিশবাহিনী সহ মিঃ লোদী মিস লুনার বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন তখন বনহুর আত্নগোপন করেছিলো সিঁড়ির পাশেরই দেয়ালে একটা বিরাট ছবির পিছনে।

ওরা যখন গাড়িতে উঠে বসলো তখন বনহুর বুঝতে পারলো মিঃ লুনাকে তারা বন্দী করে নিয়ে গেলো, কারণ দস্যু বনহুরকে সে চেনে বা জানে এবং এটাই তার অপরাধ।

বনহুর লক্ষ্য করলো মিস লুনা মোটেই ঘাবড়ে যায়নি। অবশ্য ঘাবড়াবার মেয়েও নয় সে। গাড়িতে উঠে বসবার পূর্বে তার মুখমণ্ডল বেশ প্রসন্ন মনে হচ্ছিলো। বনহুর ঠিক অনুমান করে নিলো, সে পালাতে সক্ষম হয়েছে বলেই লুনা খুশি হয়েছে। কিন্তু কাঁদানে গ্যাস কে নিক্ষেপ করেছিলো ঐ সময় যার জন্য সে সদ্য বিপদমুক্ত হতে সক্ষম হলো?

বনহুর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ছবিখানার আড়াল থেকে। এমন সময় বয় এসে তাকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে যাচ্ছিলো, হয়তো সে পুলিশ অফিসে ফোন করে জানিয়ে দেবে তার কথাটা। বনহুর ওকে সে সুযোগ দিলো না, বয়টার সম্মুখে হাত বাড়াতেই সে বাধা পেলো এবং আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর চাপাকণ্ঠে বললো—খবরদার, চিৎকার করবি না, করলে গলা চিরে ফেলবো। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর পকেট থেকে বের করলো একটা চাকু এবং মেলে ধরলো তার গলার কাছে।

বয়টার মুখ মৃতের মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, ঢোক গিলে বললো সে—আপনি আমাকে খুন করবেন?

না করে উপায় দেখছি না।

কেন আমাকে খুন করবেন স্যার!

তুমি যদি লক্ষ্মী ছেলের মত এইঘরে চুপ করে বসে থাকো, তবে তোমাকে আমি কিছু করবো না মানে খুন করবো না, বুঝলে?

বয়টা হকচকিয়ে গেলো, ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলো সে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো আবার—একটুও শব্দ করবে না, চুপচাপ থাকো। তারপর বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে। ওদিকে পুলিশ ভ্যান দুটো তীরবেগে ছুটে চলেছে।

সামনের ভ্যানে মিস লুনা এবং লোদী, এ ছাড়া আছেন কয়েকজন পুলিশ অফিসার। পিছনের ভ্যানে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। দস্যু বনহুরকে আটক করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন মিঃ লোদী ও তাঁর দলবল।

মিঃ লোদী অবশ্য পূর্বে জানতেন না মিঃ ম্যারোলিনই স্বয়ং দস্যু বনহুর। জানলে তাকে হাতের মুঠায় পেয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না। যখন তিনি তাঁর এক গোয়েন্দা বন্ধুর কাছে বনহুরের ছবি দেখলেন তখন চিনতে ভুল করলেন না, মুহূর্তে বিলম্ব না করে পুলিশ বাহিনী নিয়ে ছুটলেন, কিন্তু এমনভাবে ব্যর্থ হবেন তিনি ভাবতে পারেন নি।

মিস লুনাকে নিয়ে যখন তারা পুলিশ অফিসে পৌঁছলেন তখন গাড়ির ড্রাইভ আসন থেকে ড্রাইভার লক্ষ্য করছিলো সবকিছু। আসলে ড্রাইভার বেশে ছিলো রহমান।

রহমান জানতো, যে কোনো সময় সর্দারের বিপদ আসতে পারে। তাই সে প্রস্তুত ছিলো এবং নিকটেই আত্নগোপন করেছিলো। শুধু সে আত্নগোপন করে সর্দার এবং পুলিশমহলের গতিবিধিই লক্ষ্য করছিলো না, সে লক্ষ্য করছিলো মিস লুনার বাসভবনের প্রতিটি ব্যক্তির চলাফেরা।

সর্দার যখন মিস লুনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত তখন পুলিশমহলের গতিবিধি সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিলো রহমানের, তাই সে একটা কাঁদানে গ্যাস সংগ্রহ করে রেখেছিলো। বুদ্ধিমান রহমান এ মুহূর্তে যদি ঠিকমত প্রস্তুত না থাকতো তাহলে হয়তো বনহুর এত সহজে সরে পড়তে সক্ষম হতো না।

রহমান কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে দ্রুত সরে আসে এবং ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলে—শীঘ্র ভিতরে যাও, পুলিশপ্রধান তোমাকে স্মরণ করছেন।

ড্রাইভার রহমানের কথা বিশ্বাস করে এবং তৎক্ষণাৎ গাড়ি ত্যাগ করে সিঁড়িঘরের দিকে এগিয়ে যায়। কিছুটা এগুতেই কাঁদানে গ্যাস তাকেও আক্রমণ করে এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। এই সুযোগ নেয় রহমান, তার সংজ্ঞাহীন দেহটা দ্রুত আড়ালে সরিয়ে নিয়ে ওর পোশাক খুলে নিজে পরে নিলো, তারপর গাড়িতে চেপে বসে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

মিস লুনা সহ মিঃ লোদী দলবল নিয়ে যখন গাড়িতে এসে বসলেন তখন রহমান ড্রাইভারবেশে ড্রাইভিং আসনে বসা রয়েছে।

মিঃ লোদীর নির্দেশ পাওয়ামাত্র গাড়ি ছাড়লো রহমান।

পুলিশ অফিসে পৌছতে বিলম্ব হলো না, কারণ কোথায় যেতে হবে জানতো সে।

মিস লুনাকে বন্দী করার পর পুলিশমহল কতকটা নিশ্চিন্ত হলো, কারণ তারা জানে মিস লুনাকে জেরা করলেই আসল কথা প্রকাশ পাবে এবং জানা যাবে দস্যু বনহুরের সন্ধান।

মিস লুনাকে এক সময় বন্দীশালা থেকে হাজির করা হলো পুলিশ অফিসের বিচারকক্ষে।

নির্বাক মিস লুনা, সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

মিঃ লোদী এবং অন্যান্য অফিসার নিজ নিজ আসনে বসে রয়েছেন। তাঁরা শুধু বিস্মিতই নন, একেবারে হতবাক হয়ে গেছেন, মিস লুনাকে তাঁরা এতদিন পুলিশমহলের লোকই মনে করে এসেছেন, কিন্তু সে যে দস্যু বনহুরের সঙ্গে মিশে কাজ করছে, এ কথা বিশ্বাস হচ্ছে না কারও।

মিঃ লোদীও ভাবছেন মিস লুনাকে নিয়ে তাঁর মনে একটা সন্দেহ বহুদিন থেকে উঁকি দিচ্ছিলো, সেই সন্দেহ আজ বদ্ধপরিকর হয়েছে। এতদিন তাহলে মিস লুনা পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে দস্যু বনহুরকে সহায়তা করে এসেছে। সেজন্যই দস্যু বনহুরকে হাতে নাতে পেয়েও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলো না।

মিঃ লোদীর চিন্তায় বাধা পড়লো, মিস লুনাকে হাজির করা হলো তাদের সম্মুখে।

মিস লুনা নির্বাক, স্থির। মাথাটা তার নত না হলেও কিছুটা ঝুঁকে আছে সম্মুখের দিকে, তবে দৃঢ় তার মুখভাব। পুলিশ অফিসার সবাই একসঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তাঁর মুখে।

দেয়াল ঘড়িটার টিক টিক শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাইরে প্রহরীর ভারী বুটের আওয়াজ অদ্ভুত শোনাচ্ছে। পাশের কক্ষ থেকে ভেসে আসছে কোনো অফিসারের কণ্ঠস্বর!

মিঃ লোদী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—মিস লুনা, আপনি কি সত্যি পুলিশবাহিনীকে ধোঁকা দিয়ে এসেছেন এতদিন? বলুন, মিথ্যা বলার চেষ্টা করবেন না।

মিস লুনা দৃঢ়কণ্ঠে যা সত্য আমি তাই বলবো।

হাঁ, যা সত্য তাই বলবেন বলেই আমরা আশা করছি। বললেন মিঃ লোদী।

মিস লুনা একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো সবার মুখে, তারপর শান্ত স্থিরকণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে আমি প্রথম থেকেই উৎসাহী ছিলাম কিন্তু পরে যখন জানতে পারলাম, দস্যু হলেও বনহুর সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক অনেক শ্রেয় তখন...... কথা শেষ না করেই থামলো মিস লুনা।

বিস্ময়ভরা গলায় বলে উঠলেন মিঃ কিবরিয়া—দস্যু বনহুরকে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছেন মিস লুনা?

মিস লুনা কোনো জবাব দেবার পূর্বেই বলে উঠলেন মিঃ লোদী —অবশ্য মিস রুনার দোষ নেই এ ব্যাপারে, কারণ বুদ্ধিমান দস্যু বনহুর তাকে এমনভাবে অভিভূত করে ফেলেছে, যার দরুণ তিনি তাকে ফেরেস্তা বা দেবতার মত মনে করছেন। দেখুন না পুলিশ মহলের সবার মনকেও সে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত সে কাজ করেছে বা করছে, যার জন্য তার প্রতি মানুষের একটা প্রবল ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়েছে। মিস লুনাও কিন্তু তেমনি একটা ভাবাবেগের স্বীকার। যাক ও কথা, এবার বলুন মিস লুনা, আপনি কি দস্যু বনহুরের পক্ষ অবলম্বন করে তাকেই সমর্থন করে যাবেন?

মিস লুনা কোনো জবাব না দিয়ে তাকালো পাশের টেবিলে রিসিভারটার দিকে।

বললেন মিঃ লোদী—জবাব দিন?

আপনারা ভাবাবেগেই বলুন আর যাই বলুন, যা সত্য আমি তাই বলছি।

মিস লুনা, দস্যু বনহুরকে আপনি সমর্থন করেন এটা চরম অপরাধ এবং এ কারণেই আপনাকে আমরা গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছি।

আমি এজন্য দুঃখিত নই।

মিস লুনা!

হাঁ, আপনারা তার শুধু দোষনীয় দিকটা দেখে আসছেন, কিন্তু আসলে সে একজন দেশপ্রেমিক, দেশের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী, তা কোনোদিন আপনারা স্বীকার করে নেন নি।

মিঃ লোদী বলে উঠলেন—অপরাধ যার আকাশচুম্বী, সামান্য জনহিতকর কাজে তার ক্ষমা হয় না মিস লুনা।

যে বিদেশী শত্রু চরমভাবে দেশ ও দশের ক্ষতি সাধন করে চলছিলো, দেশকে পঙ্গু করে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো, তাদের সব ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছে ঐ একটিমাত্র মানুষ যাকে আপনারা এ মুহূর্তে ভুল বুঝছেন মিঃ লোদী এবং তাঁর কাজকে সামান্য জনহিতকর কাজ বলছেন।

মিঃ লোদী হাসলেন, তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠলো কর্তব্যের ছাপ। তিনি বললেন—মিস লুনা, বনহুর যতই যা করুক তাতে তার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হবে না। তাকে পুলিশমহল গ্রেপ্তার করতে সদা প্রস্তুত.........কথাটা শেষ না করেই চুপ করে যান তিনি।

মিঃ লোদী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন।

মিস লুনা কিছু ভাবছে।

দেয়াল ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে সময় পেরিয়ে চলেছে।

মিঃ কিবরিয়া বললেন এবার—স্যার, মিস লুনা যদি বনহুরকে গ্রেপ্তারে আমাদের সহায়তা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে পুলিশমহল তাকে নজরবন্দী অবস্থায় মুক্তি দিতে পারে?

মিঃ লোদী পূর্বের চেয়ে আরও বেশি গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন—মিস লুনাকে আমরা প্রথমে সেই রকম বিশ্বাস করেই কাজে আহ্বান জানিয়েছিলাম কিন্তু মিস লুনা আমাদের চোখে ধোঁকা দিয়ে দস্যু বনহুরকে সহায়তা করে চলেছিলেন এবং সে কারণেই আমরা তাঁকে বন্দী করেছি।

মিস লুনা নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো এতক্ষণ, এবার সে বললো—আমি মানুষকে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি তার কাজকে। ব্যক্তিগত চরিত্র কার কি এটা আমি জানতে চাই না। আর চাই না বলেই আমি যখন দস্যু বনহুরের আসল পরিচয় পেলাম তখন তাকে বিপদে ফেলার কথা ভাবতে পারলাম না, কারণ দস্যু বনহুর তখন দেশ ও দেশবাসীর পরম উপকার সাধনে রত ছিলো।

মিস লুনার কথাগুলো মিঃ লোদী এবং পুলিশ অফিসারদের কানে প্রবেশ করলে তাঁরা মিস লুনাকে নানা প্রশ্ন করে চললেন।

কিন্তু মিস লুনা কারও প্রশ্নের জবাব দিলো না।

যতটুকু পুলিশমহল জানতে পারলেন ততটুকুই ডায়রী করে নিলেন তাঁরা। তারপর মিস লুনাকে পুনরায় আটক করে রাখলেন।

কথাটা রহমান এসে জানালো বনহুরের কাছে।

বনহুর তখন সবেমাত্র শহরের আস্তানায় ফিরে এসে নিজ বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করে শয্যা গ্রহণ করেছে। দেহে তার জমকালো পোশাক, পায়ে ভারী বুট, কোমরের বেল্টে রিভলভার এবং সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

রহমান শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। তার দেহে এখনও সেই ড্রাইভারের পোশাক রয়েছে। সুযোগ পেয়ে সে চলে এসেছে কিন্তু পোশাক পাল্টানোর মত সময় তার হয় নি।

মিস লুনাকে পুলিশ অফিসে পৌঁছে দেবার পর রহমান মাত্র কয়েক ঘন্টা বিলম্ব করার অবকাশ পেয়েছিলো। তার মধ্যে রহমান অনেক কিছু জেনে নিতে পেরেছিলো, মিস লুনাকে পুলিশ অফিসারগণ কি জেরা করলেন এবং তার প্রতি কি প্রকার আচরণ করলেন তাঁরা, আর কোথায় তাকে কেমনভাবে বন্দী করে রাখা হলো—সব জেনে নিয়েই এসেছে সে।

বনহুর বললো—মিস লুনাকে যেমন করে হোক মুক্ত করে আনতেই হবে এবং সে দায়িত্বভার তোমার।

রহমান বললো—আপনার আদেশ শিরোধার্য।

এমন সময় দিপালী একটা রেকাবিতে কিছু ফলমূল নিয়ে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানালো বনহুরকে।

রহমান বললো—সর্দার, মিস লুনাকে পুলিশমহলের বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে আনতে হলে হয়তো দিপালীর সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে।

বললো বনহুর—নিশ্চয়ই দিপালী তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।

দিপালী কিছু না বুঝতে না পেরে একবার বনহুর এবং একবার রহমানের মুখের দিকে তাকালো।

বললো রহমান—দিপালী, তোমার সঙ্গে কিছু আলাপ আছে, প্রয়োজনমত করবো।

দিপালী শান্ত ধীর গলায় বললো—আচ্ছা।

রহমান বেরিয়ে গেলো সর্দারকে কুর্ণিশ জানিয়ে। দিপালীও বনহুরের শয্যার পাশে টেবিলে হাতের রেকাবি রেখে রহমানকে অনুসরণ করে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। বনহুর ডাকলো—দিপালী!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো দিপালী, নত চোখ দুটো তুলে ধরলো সে সর্দারের মুখে।

বনহুর বললো—দিপালী, কতদিন হলো তুমি আমার আস্তানায় রয়েছো। আমাদেরই একজন তুমি অথচ আজও তোমার এত দ্বিধা, এত সংকোচ?

দিপালী তার চোখ দুটোকে নত করে নিয়েছে। বনহুর একটা ফল রেকাবি থেকে তুলে নিয়ে বললো—দিপালী, তুমি হয়তো শুনেছো আমরা একটা বিরাট কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলাম এবং সফলকামও হয়েছি।

হাঁ, কায়েস ভাইয়ের মুখে কিছু কিছু শুনেছি। বিদেশী চক্রান্তকারীরা যে আমাদের দেশের এতবড় সর্বনাশ চালিয়ে যাচ্ছে—এটা সত্যি বিস্ময়কর।

দিপালী, বিদেশী শত্রুরা আমাদের দেশের শুধু সর্বনাশ করে যাচ্ছে না, তারা দেশবাসীদের নানাভাবে আকৃষ্ট করে ফুসলিয়ে নানা ছলনায় এবং কৌশলে নিজে দেশে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর তাদেরকে নানাভাবে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে। বিশেষ করে আমাদের দেশের যুবশক্তিকে তারা বানচাল করে দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেছে। বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি সাধন শিক্ষা তাদের দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের দেশে পাঠানো হচ্ছে। নির্বোধ শত্রুদের কুচক্রে পড়ে নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই সাধন করে চলেছে। তারা বুঝতে পারছে না শত্রুর কারসাজি। হাঁ, যা বলতে চাইছি শোন।

বলুন সর্দার?

শুধু যে তারা আমাদের দেশের যুবকদের ফুসলিয়েই নিয়ে যাচ্ছে তা নয, তারা নিজেদের বৃহৎ শক্তিকে ব্যবহার করছে আমাদের দেশের ক্ষতি সাধন ব্যাপারে। যার কিছুটা হয়তো শুনে থাকবে তুমি কায়েস অথবা রহমানের মুখে।

আমি সব শুনেছি, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিদেশী শত্রুগণ আমাদের সোনার দেশকে শ্মশানে পরিণত করার কাজে লিপ্ত আছে। একটা ডুবুজাহাজ নিয়ে একদল শত্রু জুব্রা নদের গভীর পানির তলায় লুকিয়ে থেকে মারাত্মক কোনো যন্ত্রের সাহয্যে বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিচ্ছিলো।

হাঁ দিপালী, তুমি তাহলে সবই শুনেছো।

সর্দার, আপনার সফলতাই দেশ ও দেশবাসীকে আজ মস্তবড় এক বিপদ এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করলো...

না, শুধু আমার একার চেষ্টায় এ কাজে সফলতা আসেনি দিপালী। তুমি হয়তো মিস লুনার কথা শুনেছো, সেই মহিলার বুদ্ধিমত্তার জন্যই আমি কৃতকার্য হয়েছি।

হাঁ, তার সব কথা আমি শুনেছি। আরও শুনেছি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে আটক রেখেছে।

দিপালী নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো, দৃষ্টি তার বনহুরের হাত দু'খানার উপর সীমাবদ্ধ রয়েছে। ভাবছে দিপালী, ঐ হাত দু খানার কথা। বলিষ্ঠ শক্তিশালী

ঐ হাত দু'খানার ক্ষমতা অপরিসীম, যার সঙ্গে তুলনা হয় না কোনো হাতের।

কি ভাবছো দিপালী?

উঁহু, কিছু না। চলে যাবার জন্য দিপালী পা বাড়ালো আবার।

বনহুর বললো—যা বলার তা এখনও বলা হয়নি, কাজেই তোমাকে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে।

দিপালীর গন্ডদ্বয় রক্তাভ হয়ে উঠলো, সর্দারের গলায় সে শুনতে পেলো কেমন অনুরোধের সুর। দিপালী আংগুলে আঁচল জড়িয়ে কিছু ভাবতে লাগলো।

বনহুর ছুরি দিয়ে ফলটা কেটে একটুকরা নিয়ে মুখে পুরে চিবুতে লাগলো, তারপর বললো—দিপালী, বিদেশী কুচক্রীদল শুধু ডুবুজাহাজে আত্মগোপন করেই কাজ চালিয়ে চলেছিলো তা নয়, তারা নানাভাবে আমাদের দেশের ক্ষতিসাধন করেছে। দিপালী, আমি তার মূল উদঘাটন করতে চাই। একটু থেমে বললো বনহুর—আমি সন্ধান পেয়েছি কোনো এক কুচক্রীদলের, যার নেতা ক্যারিলংকো। এই ক্যারিলং বিদেশী সরকারের বিরাট এক শক্তি—প্রকৌশলীও বটে। এই ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার জন্যই বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের দেশের এত বড় বড় ক্ষতিসাধনে সফলকাম হচ্ছে। দিপালী, জুব্‌রা বাঁধ ধ্বংস করে এরা এই সুন্দর দেশটার কি যে ক্ষতি করেছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। জুব্‌রা বাঁধ ধ্বংস করার পর জুব্‌রার তীরস্থ দু'পাশে যে দৃশের অবতারণা হয়েছিলো তা সত্যি মর্মস্পর্শী......দিপালী তুমি যদি দেখতে তাহলে কিছুতেই অশ্রুরোধ করতে পারতে না। সেকি হৃদয়বিদারক দৃশ্য—কাদা আর মাটির মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে অসংখ্য মৃতদেহ। অগণিত নারী-পুরুষের গলিত দেহ কোনোটা উবু হয়ে, কোনোটা চীৎ হয়ে আবার কোনো জননীর কোলে তখনও সন্তান রয়েছে। মৃত্যু বিভীষিকার করাল গ্রাস জননীর কোল থেকে শিশু সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেনি। দিপালী, আরও দেখেছি কোনো সন্তান বৃদ্ধ মাতাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে হয়তো বা ভেবেছিলো মাকে সে রক্ষা করবে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস থেকে। গলাটা বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বনহুরের।

দিপালী বুঝতে পারে সর্দারের অন্তর ব্যথায় জর্জরিত হয়েছে। কঠিন হৃদয়টার মধ্যেও যে একটা কোমল মন লুকিয়ে আছে বেশ উপলব্ধি করে দিপালী, সে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে তাকায় বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো—এমনি শতশত নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, কত জীবজন্তু প্রাণ হারিয়েছে তার হিসেব নেই। নরপশুর দল শুধু জুব্‌রা বাঁধ ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হতো না বা হয় নি, তারা এর পূর্বে আমাদের দেশের বহু

বৃহৎ ক্ষতি সাধন করেছে। আর একটা যে বিরাট ক্ষতি করতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো তা হলো এক ভয়াবহ প্রাণনাশ। একটা বিরাট জাহাজকে তারা ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলো। আমি তাদের সব কারসাজি বিনষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়েছি, বানচাল করে দিয়েছি তাদের সব প্রচেষ্টা।

সর্দার!

হাঁ দিপালী, তবে এ ব্যাপারে আমাকে যে সহায়তা করেছিলো সে হলো সেই মিস লুনা। তার সাহায্য না পেলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি এ কাজে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হতাম না। একটু থামলো বনহুর, তারপর বললো—মিস লুনা এখন পুলিশ হাজতে বন্দী ......

উৎসুক কণ্ঠে বললো দিপালী—কেন? কেন তাকে পুলিশমহল বন্দী করেছে?

তার অপরাধ সে আমাকে চিনেও কেন পুলিশমহলের কাছে ধরিয়ে দেয় নি। কেন সে আমাকে চিনেও সহায়তা করতে গেলো।

রাজকুমার!

দিপালী, তুমি এখনও আমাকে রাজকুমার বলেই ডাকবে?

আপনি তো আমার কাছে চিরদিন রাজকুমার হয়েই আছেন এবং থাকবেন। বলুন রাজকুমার, যদি আমার দ্বারা কোনো উপকার হয়।

হাঁ, হবে এবং সেজন্যই আমি কান্দাই আস্তানায় না গিয়ে এখানে এসেছি।

বলুন রাজকুমার, কি করতে হবে আমাকে?

বনহুরের ললাটে ফুটে উঠলো একটা গভীর চিন্তারেখা। মনোযোগ সহকারে কিছু ভাবতে লাগলো সে। দিপালী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। বনহুর যখন গভীরভাবে চিন্তা করতো তখন তাকে আরও সুন্দর লাগতো। তার ললাটে ফুটে উঠতো চিন্তারেখা, চোখ দুটোকে আরও উজ্জ্বল দীপ্ত মনে হতো।

দিপালী অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকতো তখন। শুধু দিপালী নয়, বনহুরের সমস্ত অনুচর নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো সর্দারকে—এক অদ্ভুত পৌরুষদীপ্ত মুখ তার, যা তারা আর কারও মধ্যে খুঁজে পায় নি।

আজও বনহুরকে গভীরভাবে ভাবতে দেখে দিপালী বেশ উপলব্ধি করলো এমন কোনো অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে সর্দার যা তাকে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে।

দিপালী পুনরায় প্রশ্ন করলো—আমাকে যদি কোনো কাজে লাগে তাহলে বলুন, আমি প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবো।

এবার বনহুর শয্যায় উঠে বসলো, এতক্ষণ সে অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলো—সোজা হয়ে বসে বললো—জানি তুমি পারবে দিপালী, আর পারবে বলেই তো এসেছি।

বলুন কি করতে হবে?

পুলিশমহল থেকে মিস লুনাকে উদ্ধার করে আনতে হবে। যে কোনো বেশে তুমি পুলিশমহলে প্রবেশ করবে এবং পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে মিস লুনাকে কৌশলে বের করে আনবে, কারণ ক্যারিলংকোর সন্ধান জানে মিস লুনা। এই নরপশুকে শায়েস্তা করতে হলে তার প্রয়োজন।

দিপালী বললো—যা নির্দেশ করবেন আমি তাই করবো।

এ বিশ্বাস আছে বলেই তো যখন প্রয়োজন হয় তখন ছুটে আসি তোমার পাশে। কথাটা বলে বনহুর হাতের ফলটা ছুরি দিয়ে কাটতে শুরু করলো।

হঠাৎ বলে উঠলো বনহুর—আরে দিপালী, এতক্ষণ তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, বসো।

রাজকুমার!

বসো দিপালী।

দিপালী বসলো, খাটের পাশেই একটা আসন ছিলো, সেই আসনে বসলো সে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব বনহুর, আপন মনে ফল খেয়ে চললো।

দিপালী চুপচাপ বসে আছে।

পূর্বে সে দিপালী যেন এ নয়, এ এক নতুন মেয়ে। অবশ্য দিপালী সর্দারের পাশে এলে একেবারে লজ্জায় লজ্জাবতীর মত কুঁকড়ে যায়। তাকে দেখলে কেউ ভাবতেও পারবে না এই দিপালী একদিন কোনো হোটেলের নর্তকী বা বাঈজী ছিলো। শান্ত বুদ্ধিমতী নারী বলেই তাকে এখন মনে হয়। বেশভূষায় নেই তার কোনো জৌলুষ, নেই কোনো সাজসজ্জা, সাদা কাপড় সে আজকাল বেছে নিয়েছে পরার জন্য। অলংকার সে পরে না, ওসব নাকি তার ভাল লাগে না। একমাথা কালো চুল সর্বদা এলিয়ে থাকে তার পিঠে। সাদা আর কালো মিলে যেন এক অপূর্ব সমাবেশ।

যে দিপালী একদিন সদাসর্বদা সাজগোজ নিয়েই মেতে থাকতো, যার দেহে শোভা পেতো লক্ষ টাকার অলংকার, আলতা রাঙা দুটি চরণে একরাশ নুপুরের প্রতিধ্বনি জাগতো, সেই দিপালীকে আজ একগোছা রজনীগন্ধার মত লাগে।

দিপালীর মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকতো, ব্যথাবেদনা তার ছিলো না তেমন। সবাইকে সে হাসি দিয়ে বরণ করে নিতো। আজ সেই দিপালীর মুখে হাসি নেই—শুধু আছে একটা ভাবগম্ভীর চিন্তার ছাপ।

আদর্শ নারীর প্রতিমূর্তি যেন দিপালী।

বনহুর এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলো, এবার সে ভালভাবে তাকালো দিপালীর দিকে, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—দিপালী, জীবনটাকে তুমি কি এমনি করেই অবহেলায় কাটিয়ে দেবে?

দিপালী নিরুত্তর।

বনহুর শান্ত কোমল কণ্ঠে বললো পুনরায়—মোহসীন তোমাকে ভালবাসে, এ ছাড়াও সে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী......

আমি জানি রাজকুমার।

জেনেও তুমি তাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দেবে দিপালী?

রাজকুমার, আপনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। আমি জবাব দিতে পারবো না। কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো দিপালী।

বনহুর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো, তারপর সে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সম্মুখে এসে দাঁড়ালো রহমান।

সর্দার!

চোখ তুললো বনহুর।

রহমান বললো—সর্দার, বিলম্ব করা উচিত হবে না। দিপালীসহ আমি যেতে চাই এবং মিস লুনাকে মুক্ত করে আনতে চাই।

পারবে রহমান?

নিশ্চয়ই পারবো।

দিপালী তোমাকে সাহায্য করতে পারবে এ ব্যাপারে—এ ভরসা আমার আছে। তাহলে আজই দিপালীসহ তুমি চলে যাও।

আচ্ছা সর্দার!

শোনো, খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করবে যেন তোমরা কোনো বিপদে না পড়ো।

স্মরণ থাকবে সর্দার। কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো রহমান।

❑

দিপালী যখন পাশের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো তখন তাকে কেউ নারী বলে ভাবতেই পারবে না। মাথায় ক্যাপ, পরনে মূল্যবান প্যান্ট-সার্ট, পায়ে জুতো। নাকের নিচে একজোড়া সরু গোঁফ।

রহমান দিপালীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে বললো—চমৎকার, এখন কেউ তোমাকে চিনতেই পারবে না। তোমার নামটা যেন কি?

বললো দিপালী—দীপু সিং।

বাঃ চমৎকার নাম!

তবে কি যা-তা নাম হবে! বললো দিপালী।

রহমান বললো—তাহলে চলো সর্দারের কাছে বিদায় নিয়ে আসি।

না, পারবো না।

কেন?

এ পোশাকে আমি সর্দারের পাশে যেতে পারবো না। বরং তুমি গিয়ে বিদায় নিয়ে এসোগে রহমান ভাই।

কাউকেই যেতে হবে না, আমি নিজেই এসেছি। বাঃ! ভারী সুন্দর লাগছে, মানে এ পোশাকে তোমাকে বড় মানিয়েছে দিপালী।

লজ্জায় মাথাটা নত করে নিলো দিপালী।

রহমানও একটু লজ্জা পেয়েছে তবে এখন লজ্জার সময় নয়, তাকে কাজে নামতে হবে। কুর্ণিশ জানিয়ে বললো সে—সর্দার, আমরা এবার বেরিয়ে পড়তে চাই।

হাঁ, যেতে পারো। দিপালীর দিকে ভালভাবে খেয়াল রাখবে। কথাগুলো বলে বনহুর বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

রহমান দিপালীর হাত ধরে রাতের অন্ধকারে আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এলো পথে।

গাড়ি অপেক্ষা করছিলো।

রহমান আর দিপালী গাড়ির পাশে আসতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

উঠে বসলো ওরা দু'জন।

লাইট পোষ্টের আলোতে রহমান আর দিপালী উভয়ে উভয়কে লক্ষ্য করলো। দিপালীকে সত্যি আজ বড় সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে আঠারো কিংবা উনিশ বছরের যুবক মাত্র।

রহমান হেসে বললো—এর পূর্বে তুমি বহুদিন পুরুষের পোশাকে সজ্জিত হয়েছো কিন্তু এমন মানায় নি, আজ তোমাকে খুব ভাল লাগছে।

তাই নাকি? হেসে বললো দিপালী।

ততক্ষণে গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়েছে ড্রাইভার। গাড়ি এবার ছুটতে শুরু করলো।

সরু, আধো অন্ধকার পথ।

অদূরে লাইট পোষ্টগুলো মিট মিট করে জ্বলছে। চারদিকে ঘন কুয়াশা, একটা ঝিরঝিরে হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

গাড়িখানা বেগে এগিয়ে যাচ্ছে।

দু'পাশে লাইট পোষ্টগুলো তীরবেগে সরে যাচ্ছে দূরে আরও দূরে।

রহমান আর দিপালী কথা হচ্ছিলো।

তারা কাজের কথা নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে। কিভাবে কাজ শুরু করবে, এ নিয়েই কথা হচ্ছিলো তাদের মধ্যে।

ড্রাইভার গাড়ির হ্যান্ডেল চেপে ধরে সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টি তার সম্মুখে সীমাবদ্ধ কিন্তু কান দুটো সজাগ ছিলো পিছনে, ওরা কি কথাবার্তা বলছে তা শুনতে চায় সে।

জনহীন রাজপথ।

বেশ কয়েক ঘন্টা চলার পর রহমান ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে কোনো সংকেতধ্বনি উচ্চারণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা থেমে পড়লো।

নেমে পড়লো রহমান ও পুরুষবেশী দিপালী।

ওরা দু'জন এগিয়ে চললো।

পিছনে আধো অন্ধকারে পড়ে রইলো গাড়িখানা। ড্রাইভার গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। রহমান ও দিপালী যখন গাড়ি থেকে নেমে এগুতে লাগলো তখন তাদের দু'জনের হাতে ছিলো দুটো শিশি। তারা মাঝে মাঝে শিশি থেকে কিছু তরল পদার্থ মুখ গহ্বরে ফেলে দিতে লাগলো। কিছু ছড়িয়ে দিলো নিজেদের শরীরে।

যে পদার্থ তারা শরীরে ঢেলে দিচ্ছিলো তা ছিলো অত্যন্ত দুর্গন্ধময় নেশাযুক্ত পদার্থ।

তারপর দু'জন মিলে মাতালের মত চলতে চলতে এগুতে লাগলো।

এতরাতে রাজপথে দুটো মাতাল ব্যক্তি বেশি দূর এগুতে পারলো না, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে ফেললো এবং পুলিশ অফিসে নিয়ে হাজির করলো।

রহমান আর দিপালী মানে দীপুসিং যা কামনা করেছিলো তাই হলো।

পুলিশ অফিসের হাজতকক্ষে তাদের আটক করে রাখা হলো। পাশের হাজতকক্ষে রয়েছে মিস লুনা।

গভীর রাত। ঘুমের ভান করে রহমান আর দিপালী হাজতকক্ষে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো।

যখন ভোর হলো তখন দেখা গেলো হাজতকক্ষে বন্দী অবস্থায় রয়েছে দু'জন পুলিশ প্রহরী। মিস লুনা এবং মাতাল বন্দী দু'জন উধাও হয়েছে।

পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেলো।

বিস্ময়কর ব্যাপার, পুলিশ অফিসের বন্দীশালা থেকে কি করে পালালো মাতাল দু'জন। আর মিস লুনাই বা কোথায় উধাও হলো।

সমস্ত শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো।

পুলিশমহল ছদ্মবেশে নানা জায়গায় সন্ধান চালিয়ে চললো, প্রত্যেকটা পথের মোড়ে, প্রত্যেকটা সিনেমা হলে এবং হোটেলে গোয়েন্দা পুলিশ অনুসন্ধান চালালো।

কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না মাতাল বন্দী দু'জন এবং মিস লুনাকে।

যখন পুলিশমহল এই বন্দী তিন জনের সন্ধান করে ফিরছে তখন তারা পোশাক পরিবর্তন করে ফেলছে।

রহমান পরেছে সাঁওতালের পোশাক।

দিপালী নর্তকী আর মিস লুনা একটা সাঁওতাল যুবক। কয়েকজন পুলিশ যখন রাইফেল কাঁধে ওদিকে আসছিলো তখন তারা তাড়াহুড়ো করে আসর জমিয়ে নিলো

দিপালী নাচতে শুরু করলো।

রহমান বাঁশি বাজাচ্ছে।

আর মাদল বাজাতে শুরু করলো মিস লুনা।

চারিদিকে লোকজন ঘিরে ধরেছে।

দিপালী নাচে পারদর্শী, সে নাচতে পারে অদ্ভুত।

মাদল বাজাতে যদিও মিস লুনার অসুবিধা হচ্ছিলো তবু সে চালিয়ে নিচ্ছিলো কোনোরকমে।

দর্শকবৃন্দ নাচ দেখে মহাখুশি, করতালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে তারা।

পুলিশগণ যারা পলাতক বন্দী তিনজনের সন্ধানে ছিলো তারাও ঘিরে দাঁড়ালো সেখানে।

রহমান বাঁশির সুরে তাল মিলিয়ে ইংগিতে পুলিশগণকে দেখিয়ে দিলো। দিপালী আর মিস লুনাও লক্ষ্য করলো, তারা নিজ নিজ কাজে মনোযোগ

দিলো। পুলিশগুলো যেন টের না পায় বা বুঝতে না পারে তারাই পুলিশের বন্দীশালা থেকে পলাতক বন্দীরা।

দিপালী নাচতে নাচতে এক একজনের সম্মুখে হাত পেতে পয়সা সংগ্রহ করতে লাগলো। কেউ নারাজ হলো না, সবাই যে যা পারলো দিপালীর হাতের মধ্যে গুঁজে দিলো।

পুলিশ বেচারগণও না দিয়ে পারলো না, তারাও পকেট হাতড়ে যা পেলো উজার করে দিলো দিপালীর হাতে।

দিপালী নাচের ভঙ্গীমায় সেলাম জানাতে লাগলো এবং বাঁকা চোখে অভিনন্দন জানালো সবাইকে।

এমন সময় সেখানে হাজির হলেন গোয়েন্দা বিভাগের একজন পুলিশ অফিসার। তিনি দক্ষ পুলিশ গোয়েন্দা, কাজেই তাঁর মনে সন্দেহ জাগলো, ভালভাবে লক্ষ্য রেখে দেখতে লাগলেন তিনি।

পুলিশ গোয়েন্দাটি এসে জনগণের মধ্যে দাঁড়াতেই রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, সে বুঝতে পারলো লোকটা তাদেরকে সন্দেহ করছে। এখানে বেশিক্ষণ বিলম্ব করা উচিত মনে না করে রহমান তার সঙ্গীদের বললো—এবার চলো ফেরা যাক।

দিপালী বললো—চলো।

তিনজন পুঁটলি গুটিয়ে নিয়ে এগুতে শুরু করলো।

পুলিশ গোয়েন্দাটিও বুঝতে পারলেন এরা সরে পড়বার তালে আছে, তাই তিনিও এগুতে লাগলেন তাদের তিনজনকে লক্ষ্য করে।

রহমান, দিপালী আর মিস লুনা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। অদূরে পথের ধারে অপেক্ষা করছে তাদের গাড়িখানা।

আজ দু'দিন হলো গাড়িখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে পথের ধারে। কিন্তু ড্রাইভার উধাও, তাকে কেউ দেখতে পায়নি গাড়ির মধ্যে বা গাড়ির পাশে।

গাড়িতে এসে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই রহমান গাড়ি ষ্টার্ট দিলো। ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসছে নর্তকীবেশিনী দিপালী ও সাঁওতাল বেশি মিস লুনা।

গাড়ি ছুটতে শুরু করলেই গোয়েন্দা বিভাগের লোকটা মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হলেন, তিনি ভাবতেও পারেননি ওখানে থেমে থাকা গাড়িখানায় ওরা চেপে বসবে।

গোয়েন্দা বিভাগের লোকটা যখন আড়ালে আত্নগোপন করে লক্ষ্য করছিলেন তখন এই ঘটনা ঘটে গেলো। তিনি এবার ঠিক বুঝে নিলেন এই তিন ব্যক্তিই সেই পলাতক বন্দীরা, তাই দ্রুত তিনি হাতের বোতাম খুলে ঘড়ি আকার ওয়্যারলেসে পুলিশ অফিসে জানিয়ে দিলেন, ১৩নং হ্যারিন

রোড ধরে হলুদ রঙের যে গাড়িখানা ছুটে যাচ্ছে সেই গাড়িখানাকে তাড়াতাড়ি আটক করতে।

পুলিশ গোয়েন্দার বাণী শুনতে পেয়ে মুহূর্ত দেরী না করে পুলিশপ্রধান দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। একটি নয় দু'টি নয় তিন খানা পুলিশ ভ্যান আর কিছু অশ্বারোহী পুলিশ একসঙ্গে ছুটলো ১৩ নং হ্যারিন রোড ধরে। বারবার তারা স্মরণ করছেন গাড়ির রং হলুদ।

রহমান বুঝতে পারে তাদের ফলো করে কেউ অগ্রসর হচ্ছে। এবার সে নতুন কোনো পথ অবলম্বন করবে। তাই তারা বেশিদূর অগ্রসর না হয়ে কোনো এক নির্জন পথের পাশে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো, তারপর কিছুটা পথ দৌড়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো সতর্কতার সঙ্গে।

তখন পিছনে শোনা যাচ্ছে মোটরের শব্দ। অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে গাড়ি, তবে কয়খানা তা ঠিক বোঝা যাচ্ছো না।

রহমান মাটিতে কান রেখে শুনতে লাগলো, সে বেশ বুঝলো অনেকগুলো গাড়ি উল্কাবেগে আসছে। কাছেই রয়েছে তাদের হলুদ রঙের গাড়িখানা। যদি জানতে পেরে থাকে ঐ গাড়িখানা তাদের তাহলে পুলিশবাহিনী গাড়িখানার আশেপাশে তল্লাশি চালাবে তাতে কোনো ভুল নেই। আর যে গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছে তা পুলিশ ভ্যান ছাড়া আর কিছু নয়। মিস লুনা এবং দিপালীকে লক্ষ্য করে বললো রহমান—যে শব্দ তোমরা শুনতে পাচ্ছো তা পুলিশের গাড়ির শব্দ। তারা জানতে পেরেছে আমরাই সেই ব্যক্তি যারা পুলিশ হাজত থেকে কৌশলে পালাতে সক্ষম হয়েছি।

বললো দিপালী—রহমান ভাই, আমরা আর পুলিশের হাতে বন্দী হতে ইচ্ছুক নই। বলো কি করে উদ্ধার পাবো বা পেতে পারি?

মিস লুনা অত জানাশুনা না, তাই সে হঠাৎ করে কি বলবে বা করবে ভেবে পাচ্ছে না। গতরাতের কথা স্মরণ হচ্ছে তার, হঠাৎ সে নিজের দেহে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলেছিলো। কিছু না বুঝতে পেরে হক চকিয়ে গিয়েছিলো, যদিও আধো অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছিলো না, তবু আঁচ করলো কেউ তার পাশে বসে চাপাকণ্ঠে বলছে 'মিস লুনা, আমরা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনি চিৎকার করবেন না, উঠে পড়ুন" মিস লুনা স্থবিরের মত উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো এবং বেরিয়ে এসেছিলো বন্দীশালার বাইরে। মিস লুনা বেরিয়ে আসবারসময় লক্ষ্য করেছিলো বন্দীশালার প্রহরী দু'জন বন্দীশালার মেঝেতে হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে, তখনই মিস লুনা অনুমান করে নিয়েছিলো এরা নিশ্চয়ই তার হিতাকাঙ্ক্ষী, নাহলে তাকে এভাবে বন্দীশালা থেকে বের করে নিতো না। হয়তো এরা বনহুরের লোক, কারণ সে জানতো বনহুরের অসাধ্য

কিছু নেই, নিশ্চয়ই সে তাকে বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করে নেবে..... মিস লুনার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। রহমান বলছে—এখানে আর এক মুহূর্ত বিলম্বা করা উচিত নয়। অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের সরে পড়তে হবে......মিস লুনা ও দিপালীসহ রহমান ঝোপঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে ছুটতে শুরু করলো।

ততক্ষণে পুলিশ ভ্যানগুলো এসে পড়েছে নিকটে।

এদিকের বন বেশ নির্জন এবং কিছুটা অন্ধকার।

অবশ্য বেশি ঝোপঝাড় এবং শালগাছ থাকায় পথগুলো ঝাপসা অন্ধকার ছিলো। পুলিশ ভ্যানগুলো সোজাপথে এগিয়ে আসছিলো বলেই পথের ধারে থেমে থাকা হলুদ রঙের গাড়িখানা নজরে পড়লো। প্রথম গাড়িতেই ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের সেই ব্যক্তি; তিনি রহমান ও তার দলবলকে দেখতে পেয়ে সন্দেহ বশতঃ অনুসরণ করেছিলেন। তিনিই চিৎকার করে বলে উঠলেন এই তো সেই গাড়ি যে গাড়িখানাতে বন্দীরা পালিয়েছে বলে আমি সন্দেহ করছি......নিশ্চয়ই গাড়িখানার আরোহীরা আশেপাশেই আছে।

পুলিশ ভ্যানগুলো হলুদ রঙের গাড়িখানার পাশে এসে থেমে পড়লো। পুলিশবাহিনী নেমে পড়লো দ্রুত, তারপর ছড়িয়ে পড়লো বন্দীদের সন্ধানে।

ভীষণ খোঁজাখুঁজি শুরু করলো পুলিশবাহিনী কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলো না তাদের।

যখন পুলিশবাহিনী বন্দীদের সন্ধান চালিয়ে চলেছেন তখন রহমান ও তার সঙ্গীদ্বয় একটা ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বসেছিলো।

পুলিশবাহিনীর কাছ থেকে প্রায় দু'শত গজ দূরে ছিলো ওরা, তাই পুলিশবাহিনী তাদের দেখতে পেলো না। নিপুণভাবে সন্ধান চালানোর পর ওরা হিমসিম খেয়ে গেলো, নাচার অবস্থায় এক সময় ফিরে চললো।

দিপালী ও মিস লুনা হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

রহমান বললো—যাক, এ যাত্রা বাঁচা গেলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে দু'জন অশ্বারোহী তাকে দেখে ফেললো এবং সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল উদ্যত করে ধরে বাঁশিতে ফুঁদিলো। এরা ভ্যান গুলো থেকে অনেক দূরে ছিল, তাই হঠাৎ এদের নজরে পড়ে যায় রহমান।

বাঁশির শব্দ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তীব্র ছিলো। অশ্বারোহী পুলিশদ্বয় বাঁশিতে ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। বাতাসে বাতাসে গাছের শাখায় শাখায় ঝোপঝাড় জঙ্গলে একটা অদ্ভুত আওয়াজের সৃষ্টি হলো।

পুলিশ ভ্যানগুলো চলতে গিয়ে থেমে পড়লো বাঁশির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে।

ভ্যান থেকে নেমে পড়লো পুলিশবাহিনী। তারা রাইফেল উদ্যত করে ছুটলো বাঁশির আওয়াজ লক্ষ্য করে।

চারপাশ থেকে পুলিশবাহিনী যখন ঘিরে ধরলো তখন রহমান সঙ্গীদ্বয় সহ পালাবার কোনো পথ পেলো না। বললো রহমান—এবার বন্দী হলে আর মুক্তির কোনো আশা নেই......

দিপালী বললো—উপায়?

মিস লুনা বললো—এত সাবধানতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লাম.....কথাগুলো অত্যন্ত ব্যথাজড়িত কণ্ঠে বললো সে।

রহমান বললো—এত সহজে ধরা দিতে রাজি নই মিস লুনা। কথাটা বলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো রহমান। তার হাত দু'খানা মুষ্ঠিবদ্ধ হলো।

ওদিকে পুলিশবাহিনীর দু'জন জোয়ান এসে পড়েছে তাদের কাছাকাছি।

রহমানকে হ্যান্ডস আপ বলতেই রহমান হাত তুলে দাঁড়ালো কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই সে ঝাপিয়ে পড়লো পুলিশ দু'জনের উপর। পুলিশ দু'জন আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো।

ওরা টাল সামলে উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই রহমান একটা রাইফেল কেড়ে নিলো এবং উদ্যত করে ধরলো পুলিশ দু'জনকে বুক লক্ষ্য করে।

ততক্ষণে পুলিশ দুজন উঠে দাঁড়িয়েছে।

একজনের ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে, সে হাতের পিঠে ঠোঁটের গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছে নিচ্ছিলো।

বললো রহমান—এক পাও এগুবে না, তাহলেই গুলী ছুঁড়বো।

মিস লুনা আর দিপালী এসে দাঁড়িয়েছে রহমানের পাশে।

অন্যান্য পুলিশ এসে পড়েছে আরও কাছে। রহমান মিস লুনা আর দিপালীর হাত ধরে দৌড়াতে শুরু করলো।

কিন্তু বেশীদূর এগুতে পারলো না, চারিদিক থেকে পুলিশবাহিনী রহমান, দিপালী ও মিস লুনাকে ঘিরে ধরলো।

এবার বন্দী হলো তারা।

পুলিশ গোয়েন্দাটা জয়যুক্ত হলেন, বন্দীদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে ফিরে এলো পুলিশবাহিনী পুলিশ ভ্যানের পাশে। প্রথম গাড়িতেই তুলে নিলো বন্দীদেরকে।

ড্রাইভার প্রস্তুত হয়েই বসেছিলো, বন্দীদেরকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে পুলিশবাহিনী উঠে বসতেই গাড়ি ষ্টার্ট দিলো।

এবার ছুটতে শুরু করলো পুলিশ ভ্যানগুলো। পথ নির্জন।

কাজেই গাড়িগুলো অনায়াসে এগিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ গোয়েন্দাটা ক্ষুদে ওয়্যারলেসে জানিয়ে দিলো, তারা পলাতক বন্দী তিনজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। এবং অল্প সময়েই তারা পুলিশ অফিসে পৌঁছে যাবেন।

পুলিশ ভ্যানগুলো যখন উল্কাবেগে এগিয়ে যাচ্ছিলো তখন হঠাৎ একটা শব্দ সবার কর্ণগোচর হলো। শব্দটা কিসের বুঝতে বাকি রইলো না কারও।

কোনো মাইন বা ডিনামাইটের শব্দ।

একরাশ ধূয়া ছড়িয়ে পড়লো পথের উপরে।

একসঙ্গে সবগুলো পুলিশ ভ্যান থেমে পড়তে বাধ্য হলো।

পথের বুকের ধূয়া যখন পরিস্কার হলো তখন দেখা গেলো সম্মুখের পুলিশ ভ্যানখানা ফাঁকা পড়ে আছে—তাতে বন্দী তিনজন এবং ড্রাইভার নেই, শুধু সশস্ত্র পুলিশগণ সংজ্ঞাহীন অবস্থা এ ওর গায়ে হেলান দিয়ে আছে।

পুলিশ অফিসারগণ এবং পুলিশবাহিনী সবাই যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁরা কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন এ ওর মুখের দিকে।

কে ডিনামাইট ছুড়ে পথ বিনষ্ট করলো তা কেউ বুঝতে পারলেন না। পথখানার মাঝামাঝি বিরাট একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, এটাই শুধু দেখা গেলো।

বন্দীরা এবং পুলিশ ভ্যানটার ড্রাইভার নিখোঁজ হয়েছে—এরা গেলো কোথায়!

কয়েকজন পুলিশ অফিসার ভালভাবে সন্ধান চালিয়েও তাদের কোনো হদিস পেলেন না।

শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলো পুলিশ বাহিনী।

❑

ফিরে চললো পুলিশ ভ্যানগুলো।

ওদিকে তখন গোপন এক জায়গায় একত্রিত হয়েছে ওরা—রহমান, দিপালী ও মিস লুনা।

যে জায়গায় তারা একত্রিত হয়েছে ঐ জায়গাটা কোথায় কেউ ঠিক জানে না। ড্রাইভার তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে, তারা শুধু অন্ধের মত এসেছে।

এতক্ষণে যেন ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। একটা গুহায় তারা এসে দাঁড়িয়েছে। গুহাটা বহু কালের পুরোনো তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কারণ গুহার মুখে নানা ধরনের গাছগাছড়া জন্মেছে।

কতকগুলো শিকড় ঝুলছে এবং কতকগুলো শিকড় উপর থেকে নিচে নেমে এসেছে সরীসৃপের মত, তার শেষ অংশ মাটিতে পুঁতে গেছে তালবৃক্ষের গুঁড়ির মত।

গুহাপথটি সরু হলেও প্রবেশে কোনো অসুবিধা হলো না। তাই ওরা নির্বিঘ্নে প্রবেশ করলো গুহায়।

এই গুহা পর্যন্ত পৌঁছতে তাদের অনেক বিলম্ব হয়েছে।

পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে এখন।

গুহারমুখ দিয়ে পূর্বাকাশের দীপ্ত উজ্জ্বল ভোরের আলো প্রবেশ করেছে

গুহার ভিতর ঢুকেই রহমান কূর্ণিশ জানালো ড্রাইভারকে।

দিপালী আর মিস লুনা রহমানকে কুর্ণিশ জানাতে দেখে অবাক হলো। ড্রাইভারের মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ি—নিশ্চয়ই সে শিখ ড্রাইভার তাতে কোনো সন্দেহ নেই, চোখে তার কালো চশমা......কিন্তু রহমান তাকে কুর্ণিশ জানালো কেন? রহমান ড্রাইভারকে কুর্ণিশ জানাতেই দিপালী এবং মিস লুনা বিস্ময়ে তাকালো ড্রাইভারের মুখের দিকে।

ড্রাইভার এবার সবার বিস্ময় দূর করলো, সে মুখের দাড়ি আর চোখের কালো চশমা খুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে দিপালী আওয়াজ করে উঠলো—রাজকুমার আপনি!

এখন দিপালী আর মিস লুনা বুঝতে পারলো কেন রহমান ড্রাইভারকে কুর্ণিশ জানালো। মিস লুনার মুখে কোনো কথা সরলো না, সে দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে ড্রাইভারবেশী বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর এবার মাথার পাগড়ীটা খুলে নিলো হাতে, তারপর ওদিকে একটা শিকড়ের উপর বসে পড়ে বললো—পুলিশবাহিনীর লোকরা এখনও সন্ধান চালিয়ে চলেছে। তবে তারা এতদূর আসবে না, কারণ এ জায়গা হলো ঐ জায়গা থেকে ঠিক উল্টাদিকে।

মিস লুনা বলে উঠলো—আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আপনি...

আমি কি করে এলাম, এই তো?

রহমান বলে উঠলো—সর্দার, যখন পুলিশ ভ্যানগুলোর সম্মুখ পথে মাইন বার্ষ্ট হলো তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু কি করে আপনি আমাদের এই বিপদমুহূর্তে এসে হাজির হয়েছিলেন তা বুঝতে পারছি না।

দিপালী বললো—আমি নিজেও ভেবে পাচ্ছি না। রাজকুমার, আপনি তো সেই কান্দাই শহরে ছিলেন?

না, আমি তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম।

অস্ফুট প্রতিধ্বনি করে উঠলো দিপালী—আপনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন!

হঁ।

কোথায়? কোথায় ছিলেন আপনি?

তোমাদের গাড়ির ড্রাইভারের আসনে।

সর্দার! রহমান যেন আকাশ থেকে পড়লো।

তুমি বড্ড অন্যমনস্ক ছিলে তাই বুঝতে পারোনি রহমান। যদি আমি না হয়ে অন্য কেউ ঐভাবে ড্রাইভারের আসনে উপবিষ্ট থেকে তোমাদের অমঙ্গল সাধন করতো, তাহলে?

সর্দার, ক্ষমা করুন। মাথা নিচু করে কথাটা বললো রহমান।

বনহুর কিছুক্ষণ নীরব রইলো।

দিপালী বললো—রাজকুমার, আপনি তাহলে প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে থেকে সব লক্ষ্য করছিলেন?

যদিও জনাতাম রহমান এবং তুমি মিস লুনার উদ্ধার ব্যাপারে যথেষ্ট তবু কেন যেন মনটা চিন্তায় মুষড়ে পড়ছিলো, হঠাৎ যদি কোনো বিপদ আসে তখন রহমান যদি......তোমাদের দু'জনকে নিয়ে নতুন কোনো অসুবিধায় পড়ে যায়, তাই......

আপনার চিন্তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো। ভাগ্যিস আপনি এসেছিলেন তাই.........কথাটা শেষ না করেই রহমান মাথা নিচু করলো।

বনহুর বললো—রহমান, তোমার লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই। এ বিশ্বাস আমার ছিলো তুমি বিপদে পড়লেও জয়যুক্ত হবে। যাক্ ও সব কথা, এবার শোন, আমরা ক'জনই অত্যন্ত ক্লান্ত, কিছু সময় বিশ্রামের প্রয়োজন। বিশেষ করে দিপালী আর মিস লুনার জন্য......

মিস লুনা বলে উঠলো—কিন্তু এ জায়গা যদি নিরাপদ স্থান না হয়? যদি এখানে কোনো বিপদ ওৎ পেতে থাকে?

মিস লুনা, কোনো ভয় নেই। যদি তেমন কোনো বিপদ আসে তাহলেও তেমন কিছু যায় আসে না। কথাটা বলে বনহুর তার মাথার পাগড়ীটা খুলে বিছিয়ে বসে পড়লো এবং বললো—তোমরা বসো।

দিপালী আর মিস লুনা না বসে পারলো না, কারণ তারা ক্লান্ত অবশ হয়ে পড়েছিলো। পা দু'খানা তাদের ধরে এসেছিলো। বসে পড়লো ওরা বনহুরের পাগড়ীখানার উপর।

রহমান কিন্তু সর্দারের পাগড়ীর আঁচল স্পর্শ করলো না, সে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়লো পাগড়ীর অদূরে এক পাশে।

ততক্ষণে গুহার বাইরে সূর্যের আলোর তাপ প্রখর হয়ে উঠেছে। গুহার সবকিছুই এবার স্পষ্ট নজরে পড়ছে।

দিপালী আর মিস লুনা ভালভাবে বসলো।

বনহুর নিজেও দেহটা এগিয়ে দিয়েছে পাগড়ীটার উপরে।

হঠাৎ তার দৃষ্টির চলে যায় গুহার ছাদে, চমকে উঠে বনহুর—একটা বিরাট সাপ দোল খাচ্ছে গুহার ছাদে একটা ফাটলের মধ্যে।

বনহুরের দৃষ্টির সঙ্গে দিপালীর চোখ দুটোও গিয়ে পড়ে সাপটার উপর, সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠলো ভয়ার্তভাবে।

রহমান ও মিস লুনা তাকালো সেইদিকে। বিরাট সাপটাকে দেখে মিস লুনা ভয়ার্তভাবে বলে উঠলো—সর্বনাশ, কি ভয়ঙ্কর সাপ!

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মিস লুনা দৌড়ে বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভারখানা বের করে সাপটার মাথা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। অব্যর্থ তার লক্ষ্য, রিভলভারের একটা গুলীর আঘাতে বিরাট সর্পরাজের মাথাটা থেতলে গেলো।

সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। সাপটার মাথা থেতলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাপটা তড়াস করে গুহায়মেঝেতে এসে পড়লো ঠিক মিস লুনার পাশে।

মিস লুনা চিৎকার করে আঁকড়ে ধরলো দিপালীকে।

দিপালীও ভয়ে চিৎকার করে উঠলো।

বনহুর হেসে বললো—সাপটার মৃত্যু ঘটেছে, কাজেই ভয়ের কোনো কারণ নেই। পা দিয়ে বনহুর সাপটাকে উল্টেপাল্টে দেখলো, তারপর বললো—রহমান, এটাকে বাইরে নিক্ষেপ করো।

সাপটাকে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো রহমান, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে।

গুহার তলদেশ দিয়ে জংলী সর্দার কন্যা তার দু'জন সহচরী এবং কয়েকজন সহচর নিয়ে শিকারে যাচ্ছিলো রহমানের নিক্ষিপ্ত সাপটা এসে পড়লো তাদের মাঝখানে।

একসঙ্গে চমকে উঠলো জংলীকন্যা আর তার সঙ্গীরা। তারা তাকালো উপরের দিকে। হঠাৎ তাদের নজরে পড়ে গেলো রহমান। রহমান কিন্তু মোটেই তাদের দেখতে পেলো না।

সঙ্গে সঙ্গে জংলীকন্যা তাকালো উপরের দিকে।

রহমান সাপটা নিক্ষেপ করে দাঁড়াতেই জংলীকন্যা তাকে দেখে ফেললো। অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো তারা।

রহমান কিন্তু মোটেই লক্ষ্য করেনি, সাপটা সে নিচে নিক্ষেপ করে আর তাকিয়ে দেখেনি সাপটা কোথায় পড়লো।

ফিরে এলো রহমান।

ততক্ষণে বনহুর, দিপালী আর মিস লুনা মিলে কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা জুড়ে দিয়েছে।

রহমান বাইরে বসলো।

ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে।

রহমান ভাবলো ওরা গুহায় বসে কথাবার্তা বলছে বলুক, আমি গিয়ে কিছু খাবার সংগ্রহ করে আনি।

কথাটা ভাবতেই সে উঠে পড়লো এবং খাবারের সন্ধানে পা বাড়ালো সম্মুখের দিকে। একটা উচুঁ স্থানে দাঁড়িয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করতেই দেখলো কিছু দূরে একটা হরিণ আপন মনে ঘাস খাচ্ছে। সবুজ কচি ঘাসগুলো মনোযোগ সহকারে খাচ্ছে, অন্য কোনো দিকে লক্ষ্য নেই তার।

রহমান হরিণটাকে বধ করার জন্য ঝোপঝাড়ের আড়ালে আত্নগোপন করে এগিয়ে চললো। অবশ্য রহমানের কাছে একটা ক্ষুদে পিস্তল ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র ছিলো না। ঐ পিস্তল দিয়েই সে হরিণটাকে হত্যা করবে বলেই এগুলো কিন্তু হরিণটার নিকটবর্তী হতেই হরিণ টের পেয়ে গেলো এবং দিলো ভোঁ দৌড়?

রহমানও ছুটলো তার পিছু পিছু।

হরিণটাকে দেখে রহমানের জিভে পানি এসে গিয়েছিলো, কোনোরকমে ওটাকে হত্যা করতে পারলে শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে ঝলসিয়ে খাবে কিন্তু সে আশা সফল হলো না।

হরিণের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে এসে যায় রহমান। গহন জঙ্গল, চারিদিকে ঘন অন্ধকার। শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।

কোথায় হারিয়ে যায় হরিণটা।

রহমানের মনে পড়ে সেই অজানা অচেনা রাজকুমারের কথা। কোনো এক সোনার হরিণের পিছু পিছু কোনো এক রাজকুমার এসে পড়েছিলো কোনো এক গহীন বনে, তারপর হারিয়ে যায় সোনার হরিণ। রাজকুমারের সম্মুখে হাজির হয় এক রাজকুমার......

রহমানের মনে রাজকুমার আর সোনার হরিণের চিন্তা উদয় হলেও তার দৃষ্টি ছিলো হরিণটার দিকে—গেলো কোথায় হরিণটা।

এদিকে রহমান যখন হরিণটার সন্ধানে চারিদিকে অন্বেষণ করে ফিরছিলো তখন হরিণটা চলে গেছে অনেক দূরে।

গুহামুখে দৃষ্টি পড়তেই দিপালী আর মিস লুনা একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলো ভয়ে।

বনহুর একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো, হঠাৎ দিপালী আর মিস লুনার আর্তচীৎকারে চমকে উঠলো বনহুর, চোখ মেলে তাকাতেই দেখলো গুহামুখে কয়েকটা জংলী দাঁড়িয়ে আছে, হাতে তাদের অস্ত্র। চোখেমুখে প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা।

কি ভয়ঙ্কর তাদের চেহারা!

ওদের চেহারা দেখলে শিউরে উঠে শরীরের লোমগুলো।

জংলীরা গুহামুখে দাঁড়িয়ে কট্‌মট্‌ করে তাকাচ্ছে তাদের দিকে। দিপালী আর মিস লুনা ওরা দু'জন এসে আশ্রয় নিলো, বনহুরের দু'পাশে।

সে বুঝতে পেরেছে জংলীরা তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে এবং সে কারণেই তারা দলবদ্ধভাবে এসে হাজির হয়েছে গুহামুখে। একেবারে সম্মুখভাগে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে নারী। ওর দু'পাশে রয়েছে দু'জন নারী। তাদের দিকে তাকিয়ে বনহুর কিছু সময় থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর কিছু বললো বনহুর।

তবু ওরা তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বনহুর এবার রিভলভারখানা বের করে নিলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে জংলীকন্যা তার দরবলকে নির্দেশ দিলো ঝাপিয়ে পড়ার জন্য।

জংলীরা জংলীকন্যার ইংগিত পাবার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করলো।

অন্য কোনো শত্রু হলে বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুলী ছুড়তো কিন্তু গুলী না ছুঁড়ে বনহুর জংলীদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

জংলীকন্যা তার দলবলকে কিছু বললো।

সঙ্গে সঙ্গে জংলীরা নিজ নিজ হাতের অস্ত্র সংবরণ করে নিলো।

জংলীকন্যা হাত বাড়ালো বনহুরের দিকে।

বনহুর জংলীকন্যার সঙ্গে হাত মিলালো।

জংলীকন্যা বনহুরের হাতখানা মুঠায় নিয়ে তার হাতের পিঠে চুম্বন করলো।

অমনি জংলীরা এক ধরনের অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো।

দিপালী আর মিস লুনা তো অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। তারা জংলীদের বিকট চেহারা দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলো। দু'জন এসে দাঁড়িয়েছে বনহুরের দু'পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে জংলীকন্যা কিছু বললো।

অমনি জংলীরা বনহুর দিপালী আর মিস লুনাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

বনহুর বুঝতে পারলো তাদের যাবার জন্য ওরা ইংগিত করছে। তাই বনহুর দিপালী আর মিস লুনা সহ ওদের সঙ্গে রওয়ানা দিলো।

জংলীকন্যা ও তার দলবল বনহুর, দিপালী আর মিস লুনাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললো।

ঘন জঙ্গল পেরিয়ে ওরা এগুচ্ছে।

রহমান কোথায় তারা জানে না।

বনহুরের মনে বারবার উদয় হচ্ছে তার কথা, জংলীরা কোথায় তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে তাও জানে না বনহুর, দিপালী আর মিস লুনা।

উঁচুনীচু পাহাড়িয়া পথ।

জংলীদের সবার হাতেই ধারালো অস্ত্র। তারা বনহুর, দিপালী আর মিস লুনাকে ঘিরে ধরে এগুচ্ছিলো।

অনেক দূরে এসে পড়ে তারা।

বনহুর ও তার সঙ্গীরা যেমন জংলীদের কথাবার্তা বুঝতে পারছিলো না, তেমনি জংলীরা বুঝতে পারছে না তাদের কথা।

বনহুর বললো—মিস লুনা, খুব কষ্ট হচ্ছে আপনাদের, তাই না?

বললো মিস লুনা—কষ্ট হলেও কি করা যাবে বলুন?

বনহুরকে মিস লুনা প্রথমে তুমি বলে সম্বোধন করলেও আজকাল আপনিই বলে সে। কারণ প্রথমে যখন বনহুর মিস লুনাকে তার জন্ম উৎসব মঞ্চ থেকে জোরপূর্বক হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো, সেই বিধ্বস্ত জুব্‌রা বাঁধের ধারে তখন মিস লুনা রাগে ক্ষোভে অন্ধ হয়ো পড়েছিলো, বনহুরের পরিচয় পাবার পর সে কঠিন ব্যবহার করেছিলো তার সঙ্গে—অসৎ হৃদয়হীন নরপশু বলতেও সে দ্বিধা বোধ করেনি কিন্তু যখন মিস লুনা বনহুরের হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছিলো তখন তার সব রাগ ক্ষোভ কেটে গিয়েছিলো। অবাক নয়নে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলো তাকে। এ তো স্বাভাবিক মানুষ নয়, এ যে এক বিস্ময়কর ব্যক্তি। এরপর থেকে মিস লুনা তাকে সাহায্য করতে পিছপা হয় নি। কৌশলে সে এড়িয়ে গেছে পুলিশমহলকে; দমন করেছে সে তার দলের কুচক্রীদের। মিস লুনা বনহুরের আসল পরিচয় জেনেও তাকে ঘৃণা করতে পারেনি বরং এসেছে তার মনে শ্রদ্ধা। আজকাল তাই মিস লুনা বনহুরকে আপনি বলেই সম্বোধন করে।

এবার বনহুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো দিপালীর মুখের দিকে। যদিও দিপালী নিজকে সংযত করে রেখেছিলো, তার কষ্টের চিহ্ন মুখোভাবে যাতে ফুটে না উঠে সেজন্য দিপালী অত্যন্ত সজাগ ছিলো।

বনহুর বললো—দিপালী, জানি না এরা কি উদ্দেশ্যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। যদি এদের উদ্দেশ্য মহৎ হয় ভাল, নয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

রাজকুমার, যা কপালে আছে ঘটবে সেজন্য প্রস্তুত আছি। তবে ভয় হয় ওরা আমি আপনাকে....

হত্যা করে বসে, এই তো?

হাঁ, আমরা সব সহ্য করতে পারি কিন্তু আপনাকে ওরা কিছু করবে তা সহ্য করতে পারবো না। কথাটা বলে দিপালী অশ্রুসজল চোখে তাকালো বনহুরের দিকে।

মিস লুনাও স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বনহুরের মুখে। মিস লুনাকে বড় বিষণ্ন মনে হচ্ছিলো।

বনহুর, দিপালী আর মিস লুনা কিছুক্ষণ নীরবে এগুলো। তাদের কারও মুখে কোনো কথা নেই, শুধু জংলীদের নিঃশ্বাসের হুম্ হুম্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাঝেমাঝে ওরা কি যেন বলছে, বনহুর ও তার সঙ্গী দু'জন বোঝার চেষ্টা করেও বুঝতে পারছে না।

বনহুর বললো—জানি না রহমান কোথায়। সে কোনো বিপদে পড়েছে কিনা কে জানে।

দিপালী বললো—সত্যি, রহমান ভাই কোথায় গেলো, আমরা কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

মিস রুনা বেশি কিছু বলছে না, কারণ সে দিপালীর সঙ্গে তেমনভাবে পরিচিত নয়, তাই সে নীরবে এগুচ্ছিলো। রহমানকে নিয়ে মিস লুনা যে ভাবছে না তা নয়। ঐ লোকটাই তাকে কৌশলে পুলিশের বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে এনেছে তাতে কোনো ভুল নেই। এ কথা মিস লুনা দিপালী এবং বনহুরের আলাপের মধ্যেও জানতে পেরেছে, তাই সে ভাবছে বেশি করে। লোকটা গুহা থেকে বেরিয়ে গেলো, তারপর ফিরে এলো না আর......

বললো বনহুর—কি ভাবছেন মিস লুনা?

মিস লুনা ক্লান্তকণ্ঠে জবাব দিলো—আমাদের যে বিপদই আসুক আমরা মাথা পেতে গ্রহণ করতে বাধ্য হবো, কিন্তু আমাদের আর একজন কোথায় উধাও হলো এটা ভেবে আমি বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

সত্যি মিস লুনা, রহমান কোথায় গেলো? সে কোনো বিপদের সম্মুখীন হলো কিনা কে জানে।

জংলীরা হঠাৎ অদ্ভুত ধ্বনি করে উঠলো।

থেমে পড়লো তারা।

বনহুর, দিপালী আর মিস রুনা দেখলো তারা এক নিভৃত স্থানে এসে পৌঁছেছে। জায়গাটা বিস্ময়কর। চারিদিকে বিরাট বিরাট নাম না জানা গাছ। মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, একপাশে একটা বিরাট মূর্তি। চোখ দুটো তার আগুনের ভাটার মত জলছে। মূর্তিটা যেন জীবন্ত। মূর্তিটার দু'পাশে দুটো সর্পরাজ মূর্তি, সম্মুখে একটা বেদী। কয়েকজন জংলী বেদীটার উপরে বসে আছে জটলা পাকিয়ে। তাদের সম্মুখে একটা অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে।

অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখার লালচে আলোতে বিকট মূর্তিটাকে ভয়ঙ্কর লাগছে। তেমনি ভয়ঙ্কর লাগছে সর্পরাজ মূর্তি দুটোকে।

শিউরে উঠলো দিপালী আর মিস লুনা।

বনহুর কিন্তু ঘাবড়ালো না, সে ঘাবড়াবার ব্যক্তিও নয়, তবে আশ্চর্য হলো, এমন মূর্তি সেও দেখেছি কোনোদিন।

মিস লুনা আর দিপালী অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ঐ বিস্ময়কর মূর্তিটার দিকে।

জংলীকন্যা দলবল নিয়ে এসে দাঁড়াতেই বেদীর উপরস্থ জংলীরা উঠে দাঁড়ালো, তাদের চোখেমুখেও একটা বিস্ময়কর ভাব ফুটে উঠেছে। জংলীকন্যা কিছু বললো।

অমনি অন্যান্য জংলী হাত বাড়ালো বনহুরের দিকে কিন্তু কেউ করমর্দন করলো না। হাত বাড়িয়ে মাথাটা কিছু নত করলো, তারপর হাত গুটিয়ে নিলো।

বনহুর শুধু মাথাটা একটু নত করে ওদের অভিবাদন গ্রহণ করলো।

দিপালী আর মিস লুনা বনহুরকে অনুকরণ করে তারই মত মাথাটা কিঞ্চিৎ নত করলো।

জংলীদের একজন বেদীর উপরে দাঁড়িয়ে একটা ঢাকের মত জিনিসে আঘাত করতে শুরু করলো।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন জংলীনারী-পুরুষ জঙ্গলের মধ্য হতে বেরিয়ে এলো, তারা এক একজন যেন এক একটা রাক্ষস বা ঐ ধরনের জীব হবে।

তাদের সম্মুখভাগে যে বিরাটদেহী জংলীটা ছিলো তাকে দেখবামাত্র জংলীকন্যা নতজানু হয়ে প্রাণিপাত জানালো। পরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিছু বললো। জংলীকন্যা বনহুর ও তার সঙ্গীদ্বয় মিস রুনা আর দিপালীকে লক্ষ্য করেই যে কিছু বললো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জংলীকন্যার কথা শেষ হতে না হতে বিরাটদেহী জংলীটা কট্ মট্ করে তাকালো বনহুর ও তার সঙ্গীদের দিকে! কিছু ইংগিত করলো সে দলবলের দিকে চেয়ে।

জংলীটার কথা বনহুর যদিও কিছু বুঝতে পারলো না, তবু সে অনুমান করে নিলো তাদেরকে বন্দী করার জন্য নির্দেশ দিলো লোকটা।

ঐ বিরাটদেহী জংলীটা যে জংলীদের সর্দার তাতে কোনো ভুল নেই।

কন্যাটি পিতাকে সত্য কথা বর্ণনা করে শোনালো যার একটা বর্ণও বুঝতে পারেনি বনহুর বা তার সঙ্গীরা।

জংলীকন্যার মুখমণ্ডল বিমর্ষ হলো মুহূর্তে।

ততক্ষণে অন্যান্য জংলীরা বনহুর ও তার সঙ্গীদেরকে আটক করে ফেললো। এক ধরনের লতা দিয়ে তৈরি দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে ফেললো। বনহুর বুঝতে পারলো না, হঠাৎ তাদেরকে নিয়ে এসে এমনভাবে কেন বেঁধে ফেলা হলো।

ইচ্ছা করলে বনহুর বাধা দিতে পারতো কিন্তু সে বাধা দিলো না। কারণ বাধা দিতে গেলে বেশি বিপদ ঘটবে দিপালী আর মিস লুনার। তাই বনহুর চুপ করেই রইলো, কি করে ওরা দেখতে চায় সে।

বনহুর আর তার সঙ্গীদেরকে যখন জংলী সর্দারের নির্দেশে মজবুত করে বাঁধা হলো তখন বনহুর নিজেও ভাবতে পারেনি এরা তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে। সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো জংলীদের কোনো কথাই তারা বুঝতে পারছে না।

জংলীকন্যা কি বললো যার জন্য সবাই এক সাথে বনহুরকে অভিবাদন জানালো। আবার জংলী সর্দার কি বুঝলো যার জন্য তাদেরকে এভাবে বন্দী করলো।

বনহুর দিপালী আর মিস লুনাকে আটক করার সঙ্গে সঙ্গে তারা বিস্ময় নিয়ে দেখলো চারজন জংলী সেই সাপটাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছে, যে সাপটাকে বনহুর সেই গুহায় রিভলভারের গুলীতে হত্যা করেছিলো।

জংলীরা সাপটাকে এনে রাখলো জংলী সর্দারের সম্মুখে।

জংলী সর্দারের চোখ দুটো মুহূর্তে জ্বলে উঠলো, তাকালো সে বনহুর ও তার সঙ্গীদের দিকে। জংলীদের দলবল ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো, যেন এই মুহূর্তে তাদের মাংস ছিঁড়ে খাবে।

এতক্ষণে জংলীদের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ বুঝতে পারলো বনহুর। প্রথমে তাদের সমীহ করে নিয়ে এলো। পরে যখন বুঝতে পেরেছে এরাই সর্পরাজটাকে হত্যা করেছে তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করেছে তাদের।

আরও বিস্ময়কর ঘটনা শুরু হলো এবার।

মৃত সর্পরাজকে ঘিরে সবাই কান্নায় ভেঙে পড়লো। সে এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেন ওদের কোনো আপনজনের মৃত্যু ঘটেছে।

বনহুর, দিপালী আর মিস লুনা সবাই হতবাক, সর্পরাজের জন্য এত কান্না কেন!

বেশ কিছুক্ষণ বিলাপ করে কাঁদলো ওরা। সর্দারমাথায় করাঘাত করে কাঁদলো, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রাগত কণ্ঠে কিছু উচ্চারণ করলো। অমনি জংলীরা চোখ মুছে ফেললো এবং ঘিরে দাঁড়ালো বনহুর, দিপালী আর মিস লুনাকে।

বিরাট আকার মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে কিছু মন্ত্র পাঠের মত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলো সর্দার। সঙ্গে সঙ্গে একজন ঢাকের আওয়াজ তুললো—ডুম্...ডুম্...ডুম্...

সম্মুখে অগ্নিকুন্ডটা এখন আরও বেশি দাউদাউ করে জ্বলছে। সেকি ভীষণ লেলিহান অগ্নিশিখা। চারদিকে লাল আলোক রশ্মির ছটা ছড়িয়ে পড়েছে।

অদ্ভুত এক পরিবেশ।

বনহুর, দিপালী আর মিস লুনা এ ওর দিকে তাকাচ্ছে।

বনহুর বললো—অবস্থা বড় সঙ্কটময়।

দিপালী বললো—নিশ্চয়ই এরা আমাদের জন্য কোনো রকম শাস্তির ব্যবস্থা করছে।

মিস লুনার মুখ ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। সে বহুবার বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু এমন অবস্থায় পড়েনি কোনোদিন। অসহায় চোখে তাকাচ্ছে সে বনহুরের মুখের দিকে।

জংলীসর্দার তখনও উচ্চস্বরে চিৎকার করে চলেছে!

অপর একজন জংলী ঢাক বাজিয়ে চলেছে এবং ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে লাফাচ্ছে। সে।

অন্যান্য জংলী অশ্রুসিক্ত নয়নে দাঁড়িয়ে কোনোকিছুর প্রতীক্ষা করছে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে শোনা গেলো একটা মড় মড় শব্দ। ভীষণ ঝড়ের মত গাছপালা ভেঙে কেউ যেন এগিয়ে আসছে। শব্দটা সোনার সঙ্গে সঙ্গে সে এক অদ্ভুত কান্ড, জংলীরা সবাই যে যেদিকে পারলো ছুটে পালাতে লাগলো।

জংলীদের অবস্থা দেখে মনে হলো তারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। উঠিপড়ি করে দৌড়ালো সবাই। নিমিশে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেলো।

শুধু দাঁড়িয়ে রইলো বনহুর আর তার সঙ্গী দু'জন।

সবার হাত এবং শরীর লতার দড়ি দিয়ে বাঁধা। কেউ এক চুলও নড়তে পারছে না।

বনহুর এবং তার সঙ্গীদ্বয় তাকালো ওদিক, যেদিক থেকে মড় মড় শব্দ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বনহুর, দিপালী এবং মিস লুনা দেখতে পেলো ওদিকের বড় বড় গাছগুলোর উপর দিয়ে বিরাট একটা মাথা। মাথাটা একটা দৈত্যরাজের তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সে দৈত্যরাজটার মূর্তিকেই জংলীরা পূজা করে চলেছে।

ভীষণ ঝড়ের মত বিরাট এক দৈত্যরাজ এগিয়ে আসছে। তার পথের মধ্যে যে গাছপালা বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই গাছপালা দৈত্যরাজ উপড়ে ফেলছে। ভেঙে ফেলছে গাছপালার মোটা মোটা শাখাগুলো।

মিস লুনার দৃষ্টি দৈত্যরাজের উপর পড়তেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো, ঢলে পড়ে যাচ্ছিলো সে, অমনি বনহুর তাকে কোনো রকমে ধরে ফেললো যদিও তার হাত দু'খানা লতার দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিলো।

দিপালীর অবস্থাও কতকটা মিস রুনার মত। পা দু'খানা ওর কাঁপছে, এই বুঝি পড়ে যাবে। দিপালীও বনহুরের পিঠে মুখ গুঁজে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো—রাজকুমার, এইবার মরতে হবে......

বনহুরের মুখেও কথা নেই, কারণ সে জানে না ঐ ভয়ঙ্কর বিরাট দেহী দৈত্যরাজ কেমন আর কি উদ্দেশ্য নিয়ে গাছপালা ভেঙে এগিয়ে আসছে।

ততক্ষণে বিরাটদেহী দৈত্যরাজ আরও এগিয়ে এসেছে।

ঐ সময় রহমান দূর থেকে দৈত্যরাজটাকে এগুতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। সে দিশেহারার মত দৌড়াতে শুরু করে। এতক্ষণ তার চিন্তা ছিলো হরিণটাকে নিয়ে। এবার তার সব চিন্তা উবে গেলো।

দৌড়াতে দৌড়াতে এসে এমন এক জায়গায় দাঁড়ালো রহমান, যে স্থানটা বেশ উঁচু। হঠাৎ তার নজরে পড়লো জংলী পরিবেষ্টিত অবস্থায় সর্দার দিপালী ও লুনা। ঐ মুহূর্তে দেখলো সে জংলীরা দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। রহমান বুঝতে পারলো দৈত্যরাজটার আগমনে জংলীরাও পালাতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু সর্দার ও তার সঙ্গে দিপালী আর মিস লুনা......তাদের কি অবস্থা হবে। দৈত্যরাজ নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করে ফেলবে তাতে কোনো ভুল নেই।

রহমানের মাথাটা বন বন করে উঠলো, এখন এ মুহূর্তে কি করা যায়! মিস লুনার দেহটা বনহুর ধরে রেখেছে কোনোরকমে। দিপালীও বনহুরের পিঠে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর তাকাচ্ছে দৈত্যরাজের দিকে।

ওদিকে দৈত্যরাজ তখন ভীষণভাবে এগিয়ে আসছে। দু'পাশের গাছপালা ভেঙে চুরমার করে ফেলছে সে।

রহমান মুহূর্তে ভেবে নিলো, তারপর সে তার হাতের সূতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা নিয়ে দ্রুত একটা গাছে উঠে বসলো।

ওদিকে তখন দৈত্যরাজ আরও নিকটে এগিয়ে এসেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মাথাটা, বিকট আকার দৈত্যটার কপালে শুধুমাত্র একটা চোখ। চোখটা যেন আগুনের গোলা! আকারে ঠিক একটা ফুটবলের মত। মানুষ বা জীবজন্তুর চোখে যেমন পাতা থাকে, এই দৈত্যরাজের চোখের উপরে কোনো আবারণ বা পাতা ছিলো না।

দৈত্যরাজ এগিয়ে আসছে তার প্রতিমূর্তিটার দিকে। চোখটা তার বলের মত ঘুরছে।

রহমান সামনের গাছটার শাখায় বসে প্রস্তুত হয়ে রইলো, যেমন করে হোক দৈত্যটার কবল থেকে বাঁচাতে হবে সর্দার, দিপালী ও মিস লুনাকে। আর মুহূর্ত বিলম্ব করা ঠিক হবে না, রহমান ছোরাখানা উদ্যত করে ধরলো! অতি নিকটে এসে পড়েছে দৈত্যরাজ। এই বুঝি সে তাকে সহ গাছটা এবার উপড়ে ফেলবে কিন্তু আরেক হাতে অপর একটা গাছকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

গাছের গুঁড়ি শক্ত মাটিতে বেশ শক্ত হয়ে ছিলো। দৈত্যরাজ সহজে গাছটাকে উপড়ে ফেলতে পারাছিলো না, টানা হেচ্‌ড়া শুরু করলো। ঐ সুযোগ নষ্ট না করে রহমান তার ছোরাটা সজোরে নিক্ষেপ করলো দৈত্যরাজের চোখ লক্ষ্য করে।

আশ্চর্য লক্ষ্য রহমানের।

দৈত্যরাজ রহমানের হাতের নাগাল থেকে আটদশ হাত দূরে ছিলো তবু রহমানের নিক্ষিপ্ত ছোরাখানা গিয়ে বিদ্ধ হলো দৈত্যরাজের চোখটার মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার করে উঠলো দৈত্যরাজ। ঠিক মেঘ গর্জনের মত। কানে তোলা লাগার উপক্রম হলো। রহমান মজবুত করে গাছটার ডাল আঁকড়ে ধরে রাখলো।

দৈত্যরাজ যে গাছটাকে উপড়ে ফেলার জন্য এতক্ষণ মল্লযুদ্ধ করে চলেছিলো তা থেকে সে মুহূর্তে বিরত হলো এবং বিকট চিৎকার করে দু'হাতে চোখ থেকে ছোরাখানা টেনে তুলে ফেললো। ছোরাখানা টেনে তুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যরাজের চোখ দিয়ে হু হু করে তাজা লাল রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

ছোরাখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে দু'হাতে চোখখানা চেপে ধরে গর্জন করছিলো দৈত্যরাজ। দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে সে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দৈত্যরাজের ভীষণ চিৎকারে প্রকম্পিত হয়ে উঠে বনভূমি। বৃক্ষলতা গুল্ম আকাশ বাতাস থর থর করে কাঁপতে থাকে। সেকি ভীষণ কানফাটা শব্দ!

রহমান ততক্ষণে নেমে এসেছে গাছটার নিচে। ব্যস্ততার সঙ্গে ছোরাখানা তুলে নিয়ে দৌড়ে গেলো সর্দার, দিপালী আর মিস লুনার পাশে।

বনহুর বলে উঠলো—রহমান তুমি!

হাঁ সর্দার.........সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা দিয়ে কেটে দিলো বনহুর, দিপালী আর মিস লুনার হাত এবং শরীরের বাঁধন, তারপর বললো—সর্দার, এখানে আর মুহূর্ত বিলম্ব করা চলবে না, কারণ আমি দৈত্যরাজটার চোখে ছোরা বিদ্ধ করে তাকে অন্ধ করে ফেলেছি। শিগ্‌গির চলুন সর্দার, নাহলে দৈত্যরাজ যদি হাতড়ে হাতড়ে এসে পড়ে, তাহলে মৃত্যু অনিবার্য......

হাঁ রহমান, ঠিক বলেছো, এখানে আর দেরী করা উচিত হবে না। শুধু ঐ দেত্যরাজই নয়—আছে অসংখ্য জংলী, যাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল। কথাটা বলেই বনহুর মিস লুনার সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিলো কাঁধে।

রহমান দিপালীর হাত ধরে অগ্রসর হলো।

কিন্তু কয়েক পা না এগুতেই জংলীরা ঘিরে ধরলো বনহুর, রহমান এবং তাদের সঙ্গিনী দু'জনকে। তখনও বনহুরের কাঁধে মিস লুনার সংজ্ঞাহীন দেহ।

জংলীরা ঘিরে ধরতেই বনহুর মিস লুনাকে মাটির উপর শুইয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। রহমানের মুঠায় তখনও দিপালীর হাত ধরা রয়েছে।

দিপালী ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, চোখে তার ভয়ার্তভাব ফুটে উঠেছে।

জংলীরা যখন তাদের দলবল সহ নানা ধরনের অস্ত্র বল্লম, শরকি, তীরধনু, পাথরের নুড়ি নিয়ে ওদের ঘিরে ধরেছে। তখনও বিরাট দৈত্যরাজ যন্ত্রণায় ভীষণ গর্জন করে চলেছে! সে সম্মুখে যা পাচ্ছে দু'হাতে তুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে।, গাছপালা ভেঙে তচনচ করে ফেলছে।

বনহুর কি করবে ভেবে নিলো।

সে ভয়ঙ্কর দৈত্যরাজের কবল থেকে রহমানের বুদ্ধিবলে যদিও উদ্ধার পেলো তারা কিন্তু আবার ভীষণ বিপদ এসে হাজির হলো। এখন উপায়? জংলীদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষার কি উপায় আছে?

বনহুর তার কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভার বের করে নিলো এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করে দৌড়ে গিয়ে অন্ধ দৈত্যরাজের বুক লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। একটা নয়, পর পর পাঁচটা। গুলী খেয়ে দৈত্যরাজ মূলহীন গাছের মত টলতে লাগলো।

তারপর ভীষণ এক গর্জন করে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

জংলীরা এই দৃশ্য লক্ষ্য করে কে কোন্ দিকে ছুটে পালাতে লাগলো, তার ঠিক নেই।

অল্পক্ষণেই জায়গাটা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেলো।

দৈত্যরাজ বনহুরের রিভলভারখানার গুলী হজম করতে পারলো না। মাটিতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট পর্বত বলে মনে হতে লাগলো।

স্থির হয়ে গেলো দৈত্যরাজের দেহটা।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো মিস লুনার জ্ঞান ততক্ষণে ফিরে এসেছে। যাক, বাঁচা গেলো তাহলে, মিস লুনাকে নিয়ে তাদের আর চিন্তার কারণ নেই।

রহমান মিস লুনার হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো।

মিস লুনা তাকালো বনহুরের মুখে।

বনহুর বললো—মিস লুনা, ঐ দেখুন দৈত্যরাজ চিরনিদ্রায় অচেতন, কাজেই ওর ভয় আর আমাদের নেই। এসো দিপালী, আর এখানে বিলম্ব করা মোটেই উচিত হবে না, কারণ জংলীরা চারপাশে ওৎ পেতে আছে......

রহমানও সর্দারের কথায় যোগ দিয়ে বললো—হাঁ, এখানে আর একদন্ডও থাকা চলবে না, যেভাবে জংলীরা আক্রমণ চালিয়েছিলো তাতে যে কোনো মুহূর্তে ওরা পুনরায় হামলা করে বসবে।

চলো রহমান... ... ... কথাটা বলেই পা বাড়ালো বনহুর। দিপালী মিস লুনা এবং রহমান এরাও এগুতে লাগলো বনহুরকে অনুরসরণ করে।

দ্রুত পা চালিয়ে তারা বনভূমি পার হয়ে বেশ ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লো।

এবার বিশ্রামের জন্য একটা উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লো বনহুর, বসে পড়ে বললো—দিপালী, মিস লুনা, আপনারাও বসুন। জংলীদের থেকে আমরা অনেকদূরে এসে পড়েছি......

মিস লুনা আর দিপালী বসলো বনহুরের কাছাকাছি। রহমান বসলো একধাপ নিচে।

সবাই ক্লান্ত, অবশ।

হাঁটবার শক্তি নেই যেন কারও।

মাথার উপর প্রখর সূর্যের তাপ আগুন ছড়াচ্ছে। একপাশে গভীর বন, অপর পাশে বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা। কোথাও উঁচুনীচু টিলা ধরনের পাথড়খণ্ড।

সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো লুনা। চোখ দুটো তার বসে গেছে। ঠোঁট দু'খানা গোলাপের পাপড়ির মত শুকিয়ে গেছে। অবশ্য দিপালীর অবস্থাও তাই, হেঁটে হেঁটে পা দু'খানা ফুলে গেছে আরও।

বনহুর বললো—একটু পরই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবে, তার পূর্বে আমরা এমন এক জায়গা বেছে নেবো যেখানে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে কাটাতে পারবো।

বনহুর সঙ্গীদের অবস্থা বুঝতে পারছিলো, তারা শুধু ক্লান্ত অবসন্ন ছিলো না, তারা ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিলো। বনহুর নিজেও ক্ষুধার্ত ছিলো তবু সে বিচলিত হয়নি, কারণ এসব তার অভ্যাস ছিলো।

বললো বনহুর—মিস লুনা, এবার উঠতে হয়। জানি আপনার কষ্ট হচ্ছে, দিপালীর অবস্থাও তাই, তবু উঠতে হবে, কারণ এ স্থান আমাদের সবার জন্য নিরাপদ নয়।

রহমান বললো—সর্দার, ওদিকে একটা ছোটখাটো পাহাড় নজরে পড়ছে। চলুন, আমরা ওখানে গিয়ে কোনো গুহায় রাত্রি যাপন করি।

হাঁ, ঠিক বলছো, তাই ভাল।

উঠে পড়লো বনহুর, রহমান, দিপালী আর মিস লুনা। এগুতে লাগলো তারা চারজন মিলে।

পাহাড়টা তাদের নিকট থেকে বেশ দূরে, কাজেই যতদূর সম্ভব পা চালিয়ে চলেছে ওরা।

উঁচুনীচু পথ, বারবার হোঁচট খাচ্ছিলো দিপালী আর মিস লুনা।

বনহুর আর রহমান তাদের সাহায্য করছিলো। তবু ওরা একেবারে যেন নেতিয়ে পড়ছিলো, মোটেই হাঁটতে পারছিলো না ওরা দু'জন।

এমন সময় তাদের কানে ভেসে এলো একটা হুইসেলের শব্দের মত আওয়াজ। তীক্ষ্ণ আর তীব্র সে আওয়াজ, যেন কানটা তালা লেগে যাবে।

ওরা সবাই কান পাতলো।

শব্দটা ঠিক পাহাড়টার দিক থেকেই আসছে। রহমান বললো—সর্দার, এ কিসের শব্দ?

বনহুর কান পেতে শুনে নিয়ে বললো—এ শব্দে সঙ্গে আমি পরিচিত রহমান। এ শব্দ কোনো সর্পরাজের কণ্ঠের হুইসেল ধ্বনি......

হাঁ, ঠিক বলেছেন সর্দার, এটা কোনো সর্পরাজেরই গলা থেকে বেরিয়ে আসছে। তাহলে তো ঐ পাহাড়টা আমাদের জন্য নিরাপদ স্থান নয় সর্দার?

মনে হচ্ছে তোমার অনুমান সত্য।

তাহলে উপায়? বললো মিস লুনা।

ক্রমেই রাতের অন্ধকার এগিয়ে আসছে; ভয় আর দুর্ভাবনায় ভরে উঠছে এদের মন, না জানি আবার কোন্ বিপদ এসে পড়বে কে জানে।

হুইসেলের শব্দটা যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে ওরাও থামলো।

সবাই একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো। ক্ষণিকের জন্য সকলে নিশ্চুপ।

বনহুরের ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে। তার নিজের জন্য কোনো ভাবনা সে করে না, যত ভাবনা তার সঙ্গীদের জন্য। বিশেষ করে মিস লুনা আর দিপালীকে নিয়ে এত দুর্ভাবনা। হাজার হোক তারা নারী, তেমন্ শক্তি বা সাহস তাদের নেই।

দিপালী বনহুরের, মুখোভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারে তাদের নিয়েই এখন ভাবছে সে, তাই বললো দিপালী—রাজকুমার, আমাদের নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না যা ভাগ্যে আছে হবে।

বনহুর বললো—দিপালী, তোমার আর রহমানের বুদ্ধিবলেই মিস লুনা পুলিশমহলের বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তাকে আমরা ফিরে পেয়েছি আমাদের মধ্যে আর আমরা মিস লুনাকে হারাতে চাই না, কারণ তার দ্বারা বিরাট একটা কাজ সমাধা করতে হবে। একটু থেমে দাঁত পিষে বললো বনহুর—ক্যারিলংকো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রখ্যাত স্মাগলার। শুধু সে স্মাগলারই নয়, তার মত অসৎ ব্যক্তি বুঝি আর দ্বিতীয়টি নেই। মিস লুনা ওর সন্ধান জানে এবং সে কথা দিয়েছে ঐ নরপশুকে শায়েস্তা করার ব্যাপারে সে আমাকে সাহায্য করবে......কিন্তু সে সুযোগ আমাদের ভাগ্যে আসবে কিনা কে জানে। কথাগুলো বলে বনহুর তাকালো সম্মুখের দিকে।

রহমান বললো—সর্দার, পাহাড় থেকে যে ভয়ঙ্কর শব্দ ভেসে আসছে তাতে ওদিকে যাওয়া সমীচীন নয়।

তাইতো ভাবছি রহমান, এই রাতটা কোথায় কাটানো যায়। সর্পরাজ এখনও তার হুইসেল ধ্বনি করে চলেছে।

বিপদ যখন আসে তখন চারিদিক থেকে আসে। একসঙ্গে ওৎ পেতেই আসে।

আর কিছুটা এগুতেই হঠাৎ দুটো আলোর বল দেখতে পেলো তারা। একটা ঝোপের মধ্যে আলোর বল দুটো জ্বলছে বলে মনে হলো।

বনহুর আচমকা দিপালী আর মিস লুনাকে ঠেলে দিলো পাথরখণ্ডের আড়ালে, তারপর নিজে পকেট থেকে দ্রুতহস্তে বের করে নিলো রিভলভারখানা। পথচলার সময় রিভলভারখানা সে পকেটে রেখে হাঁটছিলো

সর্বক্ষণের জন্য। বারবার যখন মিস লুনা আর দিপালী হোচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো তখন বনহুর তাদের সহায়তা করে চলেছিলো।

অবশ্য রহমান নিজেও সাহায্য করছিলো এ ব্যাপারে সঙ্গিনীদ্বয়কে।

রহমানও তার ছোরাখানা উদ্যত করে ধরেছে।

ঝোপের ভিতর থেকে যে আগুনের বল দুটো দেখা যাচ্ছিলো তা যে কোনো হিংস্র জন্তুর চোখ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন সন্ধ্যার অন্ধকার আরও জমাটা বেঁধে উঠেছিলো, তাই হিংস্র জন্তুর চোখ দুটোকে এত তীব্র বলে মনে হচ্ছিলো।

রহমান এগিয়ে গেলো আরও কিছুটা।

বনহুর রহমানের কাঁধে হাত রেখে বললো—বেশি সাহস এখানে কার্যকরী হবে না রহমান। জন্তুটা নিশ্চয় সিংহ এবং সাংঘাতিক হবে, কাজেই.........

বনহুরের কথা শেষ হতে না হতেই হিংস্র জন্তুটা ঘোৎ ঘোৎ শব্দ করে বেরিয়ে এলো ঝোপটার ভিতর থেকে। আধো অন্ধকারে জন্তুটার আকার স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—ঠিক যেন সজারু বা শূকরের মত। দেহে বিরাট বিরাট কাঁটা রয়েছে। পা দু'খানা থেবরো থেবরো মনে হলো।

দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করলেও খুব দ্রুত এগুতে পারছে না জীবটা, মুখটা নিচু করে অদ্ভুত শব্দ করছে আর এগুচ্ছে কিন্তু তাড়াতাড়ি এগুতে পারছে না।

জন্তুটা সম্পূর্ণ নতুন কোনো জীব হবে, কারণ এমন জন্তু ইতিপূর্বে বনহুরের নজরে পড়েনি। বনহুর রিভলভার বের করে নিয়ে জন্তুটার মাথা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। একবার নয়, দুইবার নয়—চার বার।

রিভলভারের গুলী খেয়ে জন্তুটার মুখ বিকৃত আকার ধারণ করলো কিন্তু আশ্চর্য, কোনো শব্দ বের হলো না ওর মুখ থেকে।

বনহুর ও তার সঙ্গীরা দেখলো জন্তটার দেহ দুলছে। রিভলভার গুলী তার মাথার মগজে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে বলে মনে হলো। কপাল বেয়ে দর দর করে তাজা লাল রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বিকৃত মুখখানা তুলে তাকাচ্ছে সে বারবার বনহুর ও তার সঙ্গীদের দিকে। প্রতিহিংসায় দু'চোখে তার আগুন ঝরছে কিন্তু সে নিরুপায়—রিভলভারের গুলী খেয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে কিন্তু এক পাও সে আর এগুতে পারলো না।

রহমান তার ছোরাখানা নিক্ষেপ করলো জন্তুটার মুখ লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা গিয়ে পড়লো জন্তুটার নাকের উপর।

জন্তুটা কোনোরকম শব্দ না করে আস্তে ঢলে পড়লো ঝোপটার পাশে।

বনহুর বললো—ঠিক কায়াদমত গুলীগুলো গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিলো তাই রক্ষে নাহলে এই ভয়ঙ্কর জন্তুটার কবল থেকে রক্ষা পাওয়া মুস্কিল ছিল।

যদিও বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিলো চারিদিকে তবুও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো জন্তুটাকে। যেন একটা ছোটখাটো পর্বত পড়ে আছে।

জন্তুটার চক্ষু দুটা মুদে গেছে, জিভটা বেরিয়ে পড়েছে একপাশ দিয়ে। ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো অন্ধকারেও মূলোর মত সাদা সাদা লাগছিলো।

দিপালী আর মিস লুনা এখন কতকটা শান্ত হয়েছে। যাক, আপাততঃ তাহলে তারা একটা মস্তবড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলো।

বনহুর আর রহমান অন্ধকারেও ভালভাবে জন্তুটাকে পরীক্ষা করে দেখলো, জন্তুটা একটা সজারু জাতীয় জীব। ওর শরীরের কাঁটাগুলো ঠিক সজারুর দেহের কাঁটার মতই ধারালো।

গহন জঙ্গলে কত ধরনের জীব আছে তা সঠিক বলা যায় না। কথাটা বললো রহমান।

বনহুর বললো—হাঁ, দেখলে তো কি ভয়ঙ্কর একটা জীব। যার শুধুমাত্র একটা চোখ। একটু থেমে বললো বনহুর—চলো এবার বিশ্রাম করা যাক, রাতটা কাটাতে হবে তো।

রহমান, দিপালী আর মিস লুনা বনহুরকে অনুসরণ করলো।

অদূরে একটা পাথড়খন্ডের পাশে বনহুর এসে দাঁড়ালো, বললো সে—এটাই আমরা বেছে নিলাম আজ রাতের জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে।

রহমান, দিপালী আর মিস লুনা বনহুরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর বললো—বসো তোমরা।

একে রাতের অন্ধকার, তারপর চারদিকে ঘন ঝোপঝাড়। যে কোনো মুহূর্তে কোনো হিংস্র জীবজন্তু হামলা করতে পারে। রাতের অন্ধকার না হলে এত ভাববার ছিলো না। সঙ্গে আগুন জ্বালাবার কোনো বস্তু নেই যা দিয়ে আগুন জ্বালানো যেতে পারে, কাজেই সবাই জেগে থাকবে, এই মনোভাব নিয়েই ওরা সবাই বসে পড়লো।

রাত বাড়ছে।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো সবাই।

শুধু জেগে আছে বনহুর।

যদিও তার অবস্থাও অত্যন্ত কাহিল তবু সে শক্তিশালী পুরুষ, তাই বেশি মুষড়ে পড়েনি রাতে নেতিয়ে যায় নি। পাথরখণ্ডটার সঙ্গে অর্ধ শায়িত অবস্থায় হেলান দিয়ে বসেছিলো বনহুর, একসময় সেও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

কতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলো খেয়াল নেই, হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

আলগোছে চোখ মেললো বনহুর।

অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখলো কেউ যেন তার পাশে এসে বসলো। হাঁটু গেড়ে বসলো সে আলগোছে। কোমল একটা হাতের পরশ অনুভব করলো বনহুর চিবুকে, ললাটে। কে এই নারী—মিস লুনা না দিপালী? কিন্তু ওরা তো অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তবে কি স্বপ্ন দেখছে সে?

হয়তো বা তাই—স্বপ্নই হবে।

বনহুর নিঃশ্বাস ফেললো খুব জোরে। একটা মিষ্টি গন্ধ লাগছে তার নাকে। সে চোখ মেলবার চেষ্টা করলো, পারলো না, চোখ দুটোর পাতা তার ভারী হয়ে এলো।

❑

বনহুরের যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন সে কোথায় তা নিজেই জানে না। ধীরে ধীরে চোখ মেললো এবং স্মরণ করতে চেষ্টা করলো এখন সে কোথায়। আস্তে আস্তে মনে পড়লো রাতের কথা। শুধু রাতের কথাই নয়—সব কথাই মানসপটে ভেসে উঠলো। সেই অজ্ঞাত বন, পাথরখণ্ডের পাশে তারা চারজন—রহমান, দিপালী আর মিস লুনা ঘুমিয়ে পড়েছিলো, শুধু ঘুমায়নি সে, কিন্তু আসলে কি সত্যিই সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো? নিজের মনকে প্রশ্ন করে বনহুর...হাঁ, সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো, তখন সুমিষ্ট একটা গন্ধ......তারপর মনে নেই কিছু।

বনহুর চারিদিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখলো—সেটা কক্ষ না কোনো ক্যাবিন বোঝা যাচ্ছে না ঠিকমত। স্বল্প আলোর ছটায় কক্ষটা আধো আলো আধো অন্ধকার লাগছে। ঘোলাটে মনে হচ্ছে কিছুটা।

তাকালো বনহুর চারিদিকে।

শয্যার প্রায় কছাকাছি ছাদটা। শয্যা থেকে মাত্র কয়েক হাত উপরে। একজন লম্বা মানুষ কোনোরকমে দাঁড়াতে পারবে। চার পাশের দেয়ালগুলো খুব দূরে নয়, শয্যা থেকে কয়েক হাত মাত্র।

কিন্তু একি, দেয়ালে অসংখ্য ছিদ্রপথ আছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও দেয়ালের রং গাঢ় নীল তবু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। বনহুর কিছু বুঝতে পারছে না সে এখানে কেমন করে এলো এবং কে তাকে নিয়ে এলো। সব যেন তার কাছে এলোমেলো মনে হচ্ছে।

বনহুর বিছানায় উঠে বসতে গেলো কিন্তু একি, তার হাত পা একটুও যে নড়ছে না! বুঝতে পারলো শক্ত দড়ি দিয়ে মজবুত করে বাঁধা আছে। একচুলও নড়তে পারছে না সে, তবে কি কোনো শত্রু তাকে আটক করে ফেলেছে......

হঠাৎ একটা হাসির শব্দ!

বিকট কর্কশ সে আওয়াজ।

বনহুর চোখ মেলে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হলো সে, এক অপরিচিত অজ্ঞাত ব্যক্তি তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাসছে। তার মুখমণ্ডলে কঠিন এবং প্রতিহিংসাপূর্ণ ভাব ফুটে উঠেছে সে মুখে। স্মরণ করতে চেষ্টা করলো বনহুর, ঐ মুখ ইতিপূর্বে সে দেখেছে কিনা। না, কোথাও সে দেখেনি ঐ মুখ। মানুষ তো নয়, যেন একটা জানোয়ার। বনহুর আন্দাজেই বুঝে নিলো, এই ব্যক্তি যেই হোক তাকে বন্দী করার পেছনে রয়েছে সে। কিন্তু গভীর জঙ্গলে এই ব্যক্তি কি করে তার সন্ধান পেলো? তবে কি তাকে অনুসরণ করেছিলো এরা?

লোকটা বিকট শব্দে হাসছিলো।

বনহুরকে ভাবতে দেখে হাসি থামিয়ে বললো—আমি কে তাই ভাবছো, না?

বনহুর চোখ ফিরিয়ে নিলো, হাত-পা মজবুত করে বাঁধা থাকায় সে একটুও নড়তে পারছে না। তাকাতেও ইচ্ছা হচ্ছে না লোকটার দিকে। লোকটাকে যেন জীবন্ত শয়তান বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু কে এই লোক?

কি এর পরিচয়?

বনহুরের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিলো এই প্রশ্নগুলো।

লোকটা বললো—তুমি যে অভিসন্ধি নিয়ে চলছিলে, সব আমার জানা হয়ে গিয়েছিলো এবং তোমার অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে গেছে আমার কাছে, তাই আমি কৌশলে তোমাকে আয়ত্তে এনেছি।

বনহুর মাথাটা ফিরিয়ে নিয়ে পুনরায় তাকালো লোকটার দিকে।

লোকটা তাকিয়ে আছে।

দৃষ্টি বিনিময় হলো তার লোকটার সঙ্গে।

লোকটা বলে উঠলো—তুমি বীরপুরুষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার সম্বন্ধে অনেকদিন থেকেই আমি শুনে আসছিলাম। তখন থেকেই তোমাকে দেখার বাসনা ছিলো আমার মনে।

বনহুর বললো—তুমি কে?

লোকটা একটু হেসে নিয়ে বললো—আমার পরিচয় তুমি জানতে পারবে এবং এক্ষুণি।

আমি আরও কিছু জানতে চাই তোমার কাছে?

তুমি জানতে চাও আমার কাছে?

হাঁ।

বলো কি জানতে চাও?

বনহুরের হাত-পা শক্ত দড়িতে মজবুত করে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও সে দুর্বল হয়নি বা তেমন কোনো আভাস পাওয়া যাচ্ছে না তার কণ্ঠস্বরে। বললো বনহুর—আমি বেশ বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে চেনো এবং আমাকে বন্দীও করেছো তুমি বা তোমার লোকে।

হাঁ, এ কথা সত্য।

তোমার অভিসন্ধিটাও আমি ঠিক অনুমান করতে পেরেছি।

না, তুমি আমার অভিসন্ধি জানো না। দস্যু বনহুর, তুমি আমাকে শায়েস্তা করবে বলে মনস্থির করেছিলে, কিন্তু......

বলো, থামলে কেন?

লোকটা বললো—কিন্তু আমি তোমাকে সে সুযোগ দেবো না। মিস লুনাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম অথচ সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শুধু আমার সর্বনাশ সে করেনি, আমার সরকারেরও চরম ক্ষতি সাধন করেছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বনহুর লোকটার দিকে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। কটমট করে তাকাচ্ছে সে বনহুরের মুখের দিকে এবং কথাগুলো কঠিনভাবে উচ্চারণ করছে।

বনহুর ওর কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছিলো এবং বুঝবার চেষ্টা করছিলো।

লোকটা বলেই চলেছে—মিস লুনাকে তার চরম অপরাধের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

এবার বনহুরের বুকটা ধক্ করে উঠলো, তাহলে রহমান, দিপালী, মিস লুনা এরা সবাই বন্দী এদের হাতে? এরা কারা? কি এদের উদ্দেশ্য?

এমন সময় লোকটা হাতে তালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক এসে দাঁড়ালো লোকটার দু'পাশে।

তাদের দেহে যে পোশাক ছিলো তা অত্যন্ত ভদ্র এবং সুবেশ। তারা তাকালো পূর্বের দণ্ডায়মান লোকটার মুখের দিকে।

লোকটা তাদের দিকে তাকিয়ে কিছু ইংগিত করলো।

অমনি ওরা দু'জন চলে গেলো।

লোকটা সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। একমুখ ধোঁয়া ছুড়ে মারলো বনহুরের দিকে, তারপর বললো—যে তোমাকে আশ্বাস দিয়েছিলো সেই মিস লুনা আমাদেরই একজন ছিলো...

বনহুর স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করলো লোকটার কঠিন মুখমণ্ডলের দিকে। এই ব্যক্তিটাই কি তাহলে সেই ব্যক্তি যাকে সে সন্ধান করে ফিরছে? এই লোকটাই কি মিঃ ক্যারিলং......

কি ভাবছো বনহুর?

এবার বনহুর কথা বললো—তুমি দেখছি আমার নামও জানো? যা হোক, তুমি যেই হও আমি জানতে চাই না। আমাকে বন্দী করে রেখেছো কেন?

বললো লোকটা—অচিরেই জানতে পারবে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে সেই লোক দুটি উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা পাত্র।

বনহুর ক্ষুধা-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলো, সে নিজে না বললেও বেশ বুঝতে পারছিলো শয়তান লোকটা এবং সেই সুযোগ নিয়ে বললো—বনহুর, তোমার জন্য খাবার এনেছি।

লোকটার কথা বিশ্বাস করলো না বনহুর তাই সে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলো। জানে বনহুর, নরপশুটা যেই হোক মহৎ বা সৎব্যক্তি সে নয়, কাজেই এত সহজে তাকে খাদ্য বা পানীয় দিতে পারে না। বিশ্বাসও হচ্ছে না তার, তাই সে মুখ ফিরিয়ে রাখলো অন্যদিকে।

লোকটা পুনরায় বললো—কি, মুখ ফিরিয়ে রাখলে কেন?

বনহুর তবু ওদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলো।

লোকটা বললো—ওর হাত দু'খানা খুলে দাও।

ওদের মধ্যে একজন বনহুরের হাতের বাঁধন খুলে দিলো।

অপর লোকটাকে ইংগিত করে বললো প্রথম ভদ্রলোক—যাও, ওর সম্মুখে গিয়ে ধরো পাত্রটা।

বনহুরের হাত দু'খানা মুক্ত হওয়ায় সে শয্যায় উঠে বসলো।

বনহুর উঠে বসতেই লোকটা তার হাতের পাত্রটা তুলে ধরলো তার সম্মুখে। পাত্রটায় কি আছে জানে না বনহুর, কারণ পাত্রটা ঢাকা একটা কালো কাপড়ে।

ভদ্র পোশাকপরা ব্যক্তিটি বললো এবার—নাও, এবার খেয়ে নাও।

লোকটা পাত্রসহ হাতখানা তখনও ধরে রেখেছে বনহুরের সম্মুখে।

বনহুর এবার আলগোছে সরিয়ে ফেললো কালো কাপড়ের আবরণখানা, সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো।

লোকটা হেসে উঠলো অট্টহাসি, সে হাসির শব্দে ছোট্ট কুঠরিখানা কেঁপে উঠলো। হাসি থামিয়ে বললো সে—চোখ ঢেকে ফেললে কেন বনহুর?

বনহুর চোখ থেকে হাত দু'খানা সরিয়ে নিলো। কঠিন তীব্র কটাক্ষে তাকালো সে লোকটার দিকে। মনে হলো সে চাহনি লোকটার হৃদপিণ্ডকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনবে।

লোকটা কিন্তু তখনও হাসছিলো, এবার সে বললো—মিস লুনার বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি কি দেখতে পেয়েছো এবার?

বনহুর তখনও কট্ মট্ করে তাকিয়ে আছে লোকটার মুখের দিকে।

লোকটা বলেই চলেছে—মিস লুনা শুধু বিশ্বাসঘাতকতাই করেনি, সে তোমাকে সহায়তা করেছিলো আমাদের জুব্রা নদের তলদেশে যে মহাশক্তিপূর্ণ ডুবুজাহাজ ছিলো তা নষ্ট করে দিতে, তাই মিস লুনাকে আমরা এমন শাস্তি দিয়ে হত্যা করেছি যা সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করে মৃত্যুবরণ করেছে।

বনহুরের পা দু'খানা মুক্ত ছিলো না, তাই সে ইচ্ছা থাকলেও এই কথার জবাব দিতে পারলো না, নাহলে মিস লুনার প্রতি যে মর্মান্তিক জঘন্য আচরণ লোকটা করেছে তার উচিত জবাব দিয়ে দিতো সে এই মুহূর্তে। কিন্তু পারলো না, শুধু একটামাত্র শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—নরপশু......

কি বললে, আমি নরপশু?

বনহুর কোনো কথা বললো না।

লোকটা বললো—ভেবো না তুমি মুক্তি পাবে। মিস লুনার মত তোমাকেও কঠিন শাস্তি নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

শয়তান, হাত দু'খানা মুক্ত কিন্তু পা দু'খানা মুক্ত নয়, তাই তুমি দাঁড়িয়ে কথা বলছো, নইলে......

কি বললে?

এতক্ষণে তোমার চোয়াল উল্টে যেতো।

বন্দীর মুখে এমন কথা! জানো, এই মুহূর্তে তোমাকে মিস লুনার মত......

মৃত্যুকে আমি ভয় করি না নরপশু।

মিস লুনার কাটা মাথাটা দেখেও ভয় পাওনি যে, মৃত্যু কত ভয়াবহ হতে পারে।

বনহুর তেমনি দৃঢ় আর কঠিন কণ্ঠে বললো—মিস লুনাকে হত্যা করে বাহাদুরি করছো কাপুরুষ কোথাকার। তুমি যদি নরপশুই না হতে তাহলে তাকে হত্যা করতে না।

মিস লুনাকে হত্যা করতাম না, কি বলছো। শুধু তার মাথা কেটে তাকে হত্যা করিনি, তাকে কিভাবে হত্যা করেছি শুনলে শিউরে উঠবে এবং নিজের জীবন ভিক্ষা চাইবে আমার পা ধরে। মিস লুনাকে হত্যা করবার পূর্বে তার দেহ থেকে খণ্ড খণ্ড করে মাংস বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছি......

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষলো, হাত দু'খানা দ্রুত এগিয়ে গেলো পা দু'খানার দিকে। পা থেকে দড়ি খুলে ফেলবে সে। কিন্তু সে সুযোগ তাকে দিলো না নরপশুর দল।

লোকটার ইংগিতে তার সঙ্গীদ্বয় বনহুরকে পূর্বের মত শুইয়ে দিয়ে পুনরায় তার হাত দু'খানার বেঁধে ফেললো মজবুত করে। বনহুরের পা শক্ত করে বাঁধা থাকায় সে কোনোরকম বাধা দিতে পারলো না। তবে নিশ্চুপ শুয়ে পড়লেও তার মনে ভীষণ আলোড়ন শুরু হলো। কি নির্মম জঘন্য মৃত্যু মিস লুনার ভাগ্যে ছিলো। কয়েক ঘন্টা পূর্বেও মিস লুনা তার পাশে ছিলো, কত আশা কত স্বপ্ন ছিলো তার মনে। ভাবতেও পারেনি সে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার এমন পরিণতি ঘটবে!

লোকটা বললো—কি ভাবছো?

বনহুর যেমন ছিলো তেমনি রইলো, কোনো জবাব দিলো না, মিস লুনার ছিন্ন মস্তক তার ক্ষুধা-পিপাসা সব ভুলিয়ে দিয়েছে। বিস্মৃত হয়েছে সব কথা। মনে পড়লো দিপালী আর রহমানের কথা, তবে কি তাদের অবস্থাও মিস লুনার মত হয়েছে? তাদেরকেও কি হত্যা করা হয়েছে নির্মমভাবে? শেষ পর্যন্ত রহমান আর দিপালীর ভাগ্যেও এই ছিলো......

লোকটা ইংগিত করলো, মিস লুনার ছিন্ন মস্ত নিয়ে চলে যেতে।

তৃতীয় লোকটা রেকাবিসহ মিস লুনার ছিন্ন মস্তক তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

দ্বিতীয় লোকটা বললো—মিঃ ক্যারিলং, আমি যেতে পারি?

বনহুর আশ্বস্ত হলো, তাহলে সে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে। ক্যারিলংকো.........মিস লুনা নিজকে নিঃশেষ করেও তাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গেলো......হাঁ, এবার কৌশলে কাজ হাসিল করতে হবে।

বনহুর অধর দংশন করলো।

ক্যারিলং তার সঙ্গীটাকে লক্ষ্য করে বললো—ভেবেছিলাম একে হত্যা করবো কিন্তু একে হত্যা না করে একে দিয়ে আমরা আমাদের কাজগুলো সমাধা করে নেবো। তারপর...বুঝলে মোরিং......হাত দিয়ে ইংগিতে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করলো তাকে।

মোরিং হেসে বললো—আমি নিজেও সেই কথা ভাবছিলাম ক্যারিলংকো। এই লোকটা মানে দস্যু বনহুর একটা মহাশক্তি বলা

চলে......কথাগুলো অত্যন্ত চাপাগলায় বললো লোকটা, যাতে বনহুর শুনতে না পারে।

কিন্তু ওরা জানে না বনহুরের কান কত সতর্ক, কত সজাগ। সে সব শুনতে পেয়েছে, তবু না শোনার ভান করে বলে উঠে—বড় পিপাসা, আমাকে একটু পানি দাও, পানি......

আবার অট্টহাসি হেসে উঠলো ক্যারিলং। হাসি থামিয়ে বললো—পানি পান করবে? বেশ তো, পানি পাবে, এমনকি জীবনভিক্ষাও পেতো পারো যদি আমাদের কথায় রাজি হও।

বনহুর বললো—আমি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত, আগে আমাকে পানি পান করতে দাও, তারপর যা বলবে আমি তাই করবো।

বনহুরের কথা শুনে উভয়ে তাকালো উভয়ের মুখের দিকে। ক্যারিলংকো মৃদু হাসলো, বিশাল বপুটা তার আনন্দে দুলে উঠলো, কিছু ইংগিত করলো সে তার সঙ্গীটার দিকে।

সঙ্গীটা চলে গেলো।

ক্যারিলং বললো—বনহুর, মিস লুনার পরিণতি তুমি স্বচক্ষে দেখেছো?

বললো বনহুর—হাঁ দেখেছি। কি নির্মম ভয়ঙ্কর মৃত্যু!

যদি ঐভাবে মৃত্যুবরণ করতে না চাও তাহলে......

বলো তাহলে কি করতে হবে? বললো বনহুর।

তোমাকে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

ক্যারিলং-এর কথায় বনহুরের মনটা খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো, ভুলে গেলো সে ক্ষুধা-পিপাসার কথা। যা সে কামনা করেছিলো তাই ঘটতে যাচ্ছে তার ভাগ্যে। এতবড় একটা সুযোগ আসবে তার ভাগ্যে, ভাবতেও পারেনি বনহুর। মনে মনে সে খোদার কাছে শুকরিয়া আদায় করলো।

ততক্ষণে পানির পাত্র নিয়ে দ্বিতীয় লোকটা হাজির হয়েছে। ক্যারিলং পানির পাত্র ওর হাত থেকে নিয়ে কিছুটা পানি ঢেলে দিলো বনহুরের মুখে।

বনহুর হা করে কিছুটা পানি পান করলো আর বাকি পানি ছড়িয়ে পড়লো তার মুখে, গলায় এবং বুকে।

বললো ক্যারিলং—কেমন, রাজি আছো?

আছি। বললো বনহুর।

যদি বিশ্বাসঘাতকতা করো তার শাস্তি কি জানো?

জানি।

তাহলে মুক্তি পাবে, তবে সে মুক্তি তোমাকে একেবারে মুক্ত করে দেবে না, নজরবন্দী হয়ে কাজ করতে হবে। তোমার উপর থাকবে কড়া পাহারা!

তাও জানি। ......কিন্তু আমার সঙ্গী ছিলো তিনজন। মিস লুনার পরিণতি স্বচক্ষে দেখলাম, আর দু'জন যারা ছিলো......

তারা জীবিত আছে এখনও, তবে তোমার সম্মতির উপর নির্ভর করছে তাদের বাঁচা-মরা।

বনহুরের বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেলো। তাহলে ওরা জীবিত আছে। বেচারী মিস লুনা......একটা সুন্দর জীবন অকালে ঝরে পড়লো। কত আশা ছিলো, স্বপ্ন ছিলো ওর মনে কিন্তু হায়, এমন ভয়াবহ মৃত্যু তাকে গ্রহণ করতে হলো যে সে হয়তো কোনোদিন ভাবেনি। নরপশু ক্যারিলং, যার সন্ধানে বনহুর উম্মাদ হয়ে উঠেছিলো, সেই জানোয়ারটাকে আর খুঁজতে হলো না, অতি সহজে সে নিজেই এসে ধরা দিলো, হাজির হলো তার সম্মুখে। বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো ক্যারিলং-এর মুখের দিকে, এই সেই ব্যক্তি যার চক্রান্তে দেশবাসীর আজ চরম অবস্থা। যার কুচক্রে জুব্‌রা বাঁধই শুধু ধ্বংস হয়নি, ধ্বংস হয়েছে আরও কতকিছু যা মানুষের কল্যাণার্থে গড়ে উঠেছিলো। ক্রুদ্ধ সিংহের মত ফোঁস ফোঁস করে উঠলো বনহুর।

ক্যারিলং বললো—খুব কষ্ট হচ্ছে বনহুর?

না, কষ্ট হচ্ছে না।

তবে অমন করছো কেন?

ভাবছি তোমাদের দলে যোগ দিতে পারলে নিজকে ধন্য মনে করবো।

তাহলে তুমি রাজি আছো?

রাজি! যা বলবে বন্ধু, তাই করবো।

কিন্তু কোনো রকম চালাকি চলবে না। মনে রেখো, সর্বক্ষণ তোমার পেছনে থাকবে আমাদের গুপ্তচর যারা তোমার কাজ লক্ষ্য করবে। তোমার জীবন-মৃত্যু নির্ভর করবে তোমার কাজের উপর।

বেশ, তাই হবে।

ক্যারিলং তার সহকারীর দিকে তাকালো।

সহকারী বললো—ওকে মুক্ত করে দেবো?

দাও কিন্তু মনে রাখবে একে মুক্ত করে দেওয়ার পেছনে আছে আমাদের চরম উদ্দেশ্য......

সহচরটা বনহুরের বাঁধন খুলে দিলো।

বনহুর উঠে বসলো, তারপর উঠে দাঁড়ালো। ঘরের ছাদটা যেন তার মাথা স্পর্শ করলো।

বনহুর বললো—আমাকে খেতে দাও, তারপর যা বলবে তাই করবো।

হাঁ, তোমাকে খেতে দেবো। যাও, ওকে খাবার ঘরে নিয়ে যাও।

ক্যারিলংকোর সঙ্গী দেয়ালে একটা সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের কিছু অংশ সরে গেলো একপাশে। একটা সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো।

লোকটা বনহুরকে নিয়ে সেই পথে চলে গেলো।

বনহুর নিরীহ মানুষটার মত অনুসরণ করলো তাকে। মুখে তার মৃদু হাসির রেখা। মনে মনে ভাবছে...ক্যারিলংকো, তুমি জানো না আমি তোমারই সন্ধানে বেরিয়েছি। এত সহজে তোমাকে পাবো ভাবতে পারিনি। তোমাকে এই মুহূর্তে আমি উচিত শিক্ষা দিতে পারি কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তোমাকে শিক্ষা দেবো না। মিস লুনাকে তুমি যেভাবে হত্যা করেছো সেইভাবেই আমি তোমাকে হত্যা করবো, তার পূর্বে তোমাদের সবকিছুর সন্ধান জেনে নেবো আমি। তারপর.......

লোকটা হঠাৎ থেমে পড়লো, তারপর একটা সুইচে চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটা নামতে লাগলো নিচের দিকে। মাথার উপরে ছোট ছোট আলোর বাল্ব জ্বলছে আর নিভছে।

বুঝতে পারলো বনহুর, যে মেঝেটা সাঁ সাঁ করে নিচের দিকে নামছে সেটা আসলে ঝুলন্ত মেঝে বা লিফট।

কত নিচে নামলো জানে না বনহুর।

হঠাৎ যেমন চলতে শুরু করেছিলো তেমনি আচমকা থেমে গেলো।

ফাঁক হয়ে গেলো দরজাটা।

লোকটা বনহুরকে নিয়ে নেমে পড়লো। সম্মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের গোলাকার আলোর বল। আলোর বলটা ধীরে ধীরে ঘুরছে।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে কতকটা অবাক দৃষ্টি মেলে।

লোকটা বললো—কি দেখছো?

এই অদ্ভুত আলোর বলটা দেখছি। ভারী সুন্দর কিন্তু......

এটা আলোর বল নয়।

তবে কি?

এখন নয়, পরে বলবো বা জানতে পারবে।

বেশ, চলো এখন কোথায় যেতে হবে?

প্রথমে মালিকের কাছে।

তারপর?

খেতে পাবে।

তারপর?

কাজ।

মালিক?

হাঁ।

ক্যারিলংকো যাকে প্রথম দেখলাম তিনি মালিক নন?

সে জবাব তুমি পাবে না।

কেন?

পরে সব জানতে পারবে।

এখন আমি কোথায়?

পাতালপুরীতে—যাকে বলে ভূগর্ভ......

ভূগর্ভে! বলো কি?

দস্যু বনহুর তুমি, ভূগর্ভেই তোমার আস্তানা আর তুমিই জানো না ভূগর্ভের খবর?

জানি কিন্তু এত বিস্ময়কর বস্তু কোনোদিন চোখে দেখিনি। যেমন তোমাদের এই সুড়ঙ্গপথ, যেমন তোমাদের গোল আলোর বল, যেমন অদ্ভুত তোমাদের কার্যকলাপ......

ক'দিন থাকলে সব বিস্ময় কেটে যাবে বনহুর।

তা হয়তো যাবে।

চলো, তোমাকে খাইয়ে নিয়ে তারপর তোমার কাজ বুঝিয়ে দেবো।

বনহুরের মন আনন্দে নেচে উঠলো, যদিও সে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর তবু তার সেদিকে তেমন খেয়াল নেই। অনায়াসে আপনা আপনি সে এখানে আসতে সক্ষম হয়েছে সেটাই তার চরম পাওয়া।

লোকটা বনহুরকে নিয়ে এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হলো যে কক্ষটার কোনো দরজা-জানালা নেই। শুধু একটামাত্র পথ, সে পথে তারা কক্ষে প্রবেশ করলো।

কক্ষে আলো জ্বলছে।

টেবিলে খাবার সাজানো।

টেবিলের চারপাশে চারখানা চেয়ার।

যে লোকটা বনহুরকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এলো সে বনহুরকে খাবার টেবিলে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসলো। ঢাকনা খুলে ফেললো লোকটা, তারপর বললো—খাও।

বনহুর এত বেশি ক্ষুধার্ত ছিলো যে, সে কোনোদিকে খেয়াল না করে খেতে শুরু করলো। পেট পুরে খেলো রুটি আর মাংস।

খাওয়া শেষ হলো আপন ইচ্ছায় বললো বনহুর—এবার চলো, আমার কাজ বুঝিয়ে দাও।

লোকটা হেসে বললো—এত সহজেই কাজ বুঝে নিতে চাও?

বিশ্বাস যদি না কর তাহলে কোনোদিনই কাজ বুঝিয়ে দিতে পারবে না।

শোন বনহুর, তুমি যদি কোনো চালাকি করতে যাও তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য......

এ কথা আমি জানি, কারণ বন্দী অবস্থায় আমি মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম, তোমরা আমার জীবনভিক্ষা দিয়েছো এটাই যথেষ্ট, কাজেই......

বেঈমানি তুমি করবে না তো?

দস্যু বনহুর কোনোদিন মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে বেঈমানি করে না। তোমাদের কাজ আমাকে বুঝিয়ে দাও।

বনহুর, তুমি যেভাবে কথা বলছো তাতে তোমাকে বড় সরল মানুষ বলে মনে হচ্ছে.....

যা মনে করছো আমি তাই, তবে মানুষ আমাকে ভুল বোঝে। যাক, এবার বলো তো...না ঃ তুমি বলাটা বড় অশোভনীয় লাগছে, এখন থেকে আমি আপনিই বলবো আপনাদেরকে, কারণ আপনারা মহাজ্ঞানী গুণী মহান ব্যক্তি।

বনহুর!

আপনারা দেখছি সুন্দরভাবে আমার নাম উচ্চারণ করতে জানেন!

তোমার নামটা কি বড় কঠিন শব্দ?

ঠিক তা বলছি না, বলছি আমাকে আপনারা খুব চেনেন দেখছি......

চিনবো না? তোমার নাম আমরা বহু পূর্বে শুনেছি—আরও শুনেছি তোমার কার্যকলাপ সম্বন্ধে সব কথা। তা ছাড়াও তুমি যে মিস লুনাকে কৌশলে হাত করে আমাদের চরম ক্ষতি সাধন করেছো তাও আমরা জানি এবং সে জন্যই মিস লুনাকে জীবন দিতে হয়েছে। কি ভয়ঙ্কর নির্মম শাস্তি নিয়ে তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে......

থাক, ওসব আমি শুনতে চাই না। আমি চাই কাজ করতে এবং আপনাদের সাথে মিশে এক হয়ে যেতে।

বেশ, তাই হবে।

আসলে তাই হবে বললেও তা করলো না বা হলো না। খাবার টেবিলেই পুনরায় বন্দী করা হলো বনহুরকে। অবশ্য কারণ কিছু ছিলো, বনহুরকে তারা সহজে বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

আবার সেই কক্ষ। ছোট্ট ক্যাবিন। চারপাশে দেয়ালের বেড়া, দেয়ালে অসংখ্য ছিদ্রপথ।

বনহুরকে এবার হাত-পা বেঁধে রাখা হলো না, তাকে মুক্ত করেই রাখা হলো কিন্তু অদৃশ্য দুটা চোখ তাকে সর্বক্ষণ লক্ষ্য করে চললো।

ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠতে লাগলো বনহুর।

একদিন দু'দিন তিনদিন কাটলো বনহুরের। আর একটা দিনও এভাবে কাটাতে পারবে না সে, কিন্তু উপায় কোথায়—তাকে ওরা জীবিত রেখেছে ঐ কারণে, তার দ্বারা কোনো অসাধ্য সাধন করতে চায়। বনহুর তা বেশ বুঝতে পেরেছে তাই সেও নেকা সেজে হাবা বনে গেছে এ দু'দিন বনহুর সুযোগ পেয়েছে বহু কিন্তু সে মুক্তি চায় না, সে চায় এদের আসল উদ্দেশ্য উদঘাটন করতে এবং তাদের সমস্ত কুচক্র নস্যাৎ করে দিতে।

দু'দিন শুয়ে শুয়ে শুধু ভেবেছে এসব ব্যাপার নিয়ে, ভেবেছে মিস লুনাকে নিয়ে। বারবার তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠছে তার মুখখানা। বেচারী মিস লুনাকে এভাবে বিদায় নিতে হবে, মিস লুনা নিজেও জানতো না, জানতো না বনহুরও। বনহুর ভেবেছিলো মিস লুনাকে নিয়েই সে সব কাজ সমাধা করবে, কিন্তু শুরুতেই নিভে গেলো প্রদীপশিখা। যেমন দমকা বাতাসে নিভে যায় সন্ধ্যা প্রদীপ।

রহমান আর দিপালী জীবিত আছে কিন্তু কোথায় আছে তাও জানে না বনহুর। শুধু জানে তারা জীবিত আছে। দু'দিন কেটে গেলেও তাকে আর দেখতে আসেনি ক্যারিলং বা তার সহকারী। এই কক্ষে অদ্ভুত উপায়ে খাদ্য এবং পানীয় দেওয়া হয়, তাই খেয়ে জীবন ধারণ করছে বনহুর।

তিনদিন কেটে গেলো।

গভীর রাত।

বনহুর তার ছোট্ট কক্ষটার মধ্যে দাঁড়ালো। দু'চোখ দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে তার। যেমন করে হোক আজ এই ক্ষুদে কক্ষ থেকে বেরুতেই হবে। ক্যারিলং ও তার সঙ্গী প্রথম দিন তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলো তাতে বনহুরের মনে ভরসা এসেছিলো কিন্তু এখন যেন কেমন মনে হচ্ছে। প্রতিদিন বনহুর প্রতীক্ষা করতো ওরা আসবে অথচ দিন যায় রাত আসে ওরা আসে না। ব্যাপার কি? না আসার কারণ ভেবে পায় না।

সেদিন বনহুর যখন তার শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো তখন তার মনে এক বিপুল উন্মাদনা, যেমন করে হোক বের হতেই হবে তাকে।

কৌশলে দরজার চাবিকাঠি খুলে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো বনহুর। অত্যন্ত কঠিনভাবে ক্ষুদে কক্ষটার দরজা বন্ধ করা হয়েছে। নানাভাবে চেষ্টা চালাতে লাগলো বনহুর। এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে গেলো। কতকটা আশ্চর্য উপায়েই খুলে গেলো দরজাটা। এতটুকু শব্দ হলো না।

বনহুর হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে ফেললো। নিঃশ্বাস বন্ধ করে অতি সাবধানে এগুলো সম্মুখপথে। সোজা সুড়ঙ্গপথ চলে গেছে। একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি সুড়ঙ্গপথটাকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করে রেখেছে।

বেশ কিছুদূর এগুনোর পর হঠাৎ বনহুরের কানে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের হাস্যধ্বনি, তার সঙ্গে কাঁচপাত্রের টুনটান্ আওয়াজ।

বনহুর অতি সাবধানে পা রেখে এগুচ্ছে, চারিদিকে তার দৃষ্টি রয়েছে। কিছুটা এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এলো পুরুষকণ্ঠ, প্রেয়সীর সঙ্গে প্রেমালাপ। সম্মুখের মুক্ত জানালা দিয়ে সোজা দৃষ্টি চলে গেলো কক্ষে। বনহুর দেখলো কয়েকজন নারীর সঙ্গে হাস্যরসে মেতে রয়েছে ক্যারিলং ও তার সঙ্গীটি।

বনহুর আলগোছে সরে এলো এবং সতর্কতার সঙ্গে অপরদিকে পা বাড়ালো।

কিন্তু যেমনি সে পা দিয়েছে সম্মুখে অমনি তার চারপাশে একটা বেষ্টনী তাকে আবদ্ধ করে ফেললো। বনহুর প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো, পরক্ষণেই বুঝতে পারলো তাকে পুনরায় বন্দী করে ফেলা হলো। বনহুরের কানে ভেসে এলো ক্যারিলং-এর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি।

বনহুর ফিরে তাকালো যেদিক থেকে হাসির শব্দ এলো সেই দিকে। নজরে পড়লো ক্যারিলং-এর মুখখানা, কি ভয়ঙ্কর দুটি চোখ। দাঁত পিষে বললো সে—আমার সঙ্গে চালাকি! তুমি না কথা দিয়েছিলে পালাতে চেষ্টা করবে না বা আমাদের নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না তোমার দ্বারা......এবার বুঝতে পেরেছি তুমি সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে।

বনহুর বুঝতে পারলো এখন কোনো কথা বলা বাতুলতা ছাড়া কিছু হবে না, তাই সে নিশ্চুপ রইলো।

ক্যারিলং কঠিন কণ্ঠে বললো—জানো তুমি এখন কোথায়? এমন এক জায়গায় যেখান থেকে তুমি কোনোদিন পালাতে পারবে না। বনহুর, যত নেকা সেজেই থাকো আমরা তোমার সব খবরই রাখি।

বনহুরের চারিপাশে লৌহ-শলাকার বেষ্টনী। একটুও নড়তে পারছে না সে, যেমন বন্দী সিংহ লৌহ খাঁচায় আবদ্ধ হয় ঠিক তেমনি। তাকালো বনহুর ক্যারিলং-এর মুখের দিকে।

বলে চলেছে ক্যারিলং—তোমাকে এখন পর্যন্ত জীবিত রেখেছি কোনো বিরাট একটা উদ্দেশ্য নিয়ে......ক্যারিলং তালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে তার সহকারী সেই ব্যক্তিটি এসে দাঁড়ালো তার একপাশে।

ক্যারিলং তাকে লক্ষ্য করে বললো—মোরিংকো, একে নিয়ে যাও সেই কক্ষে, যে কক্ষ থেকে ও পালিয়ে এসেছে।

এবার বনহুর বললো—পালাইনি, বেরিয়ে এসেছি।

কার অনুমতি নিয়ে তুমি বেরিয়ে এলে?

আমার নিজের মনের ইচ্ছায়।

জানো এটা কতবড় অপরাধ?

জানি তোমাদের মত নরপশুদের কাছে সবকিছুই অপরাধ। মিস লুনাকে তোমরা হত্যা করেছো, তার শাস্তি তোমরাও পাবে ক্যারলিং। শুধু লুনাকে হত্যার অপরাধই নয়, তোমরা যে জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত আছো তার ফলও তোমরা পাবে......

ক্যারিলংকো চিৎকার করে বলে উঠলো—আমাদের হাতের মুঠায় থেকে আমাদের উপর ছোবল মারছো? এই মুহূর্তে আমরা তোমাকে পিঁপড়ের মত পিষে মারতে পারি। মোরিংকো, যাও ওকে এই লৌহ খাঁচাসহ ঐ ক্ষুদে কক্ষে নিয়ে যাও। ওকে সেই শয্যায় হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে শুইয়ে রাখবে, যাও নিয়ে যাও।

ক্যারিলংকো চলে গেলো যে কক্ষে তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে ক'জন প্রেয়সী সেই কক্ষে। যাদের সঙ্গে সে কিছু পূর্বে প্রেমালাপে মত্ত ছিলো।

মোরিংকো পা দিয়ে চাপ দিলো মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে খাঁচা সহ নিজকে সেই কক্ষে দেখলো বনহুর। সত্যি বিস্ময়কর বটে।

লৌহবেষ্টনী ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে গেলো। তারপর কোথায় উঠে গেলো লৌহবেষ্টনী যাদুবিদ্যার মত।

লৌহবেষ্টনী উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন বলিষ্ঠ লোক এসে হাজির হলো সেখানে।

তাদের পেছনে মোরিংকো, হাতে তার পিস্তল।

বনহুরের বুক লক্ষ্য করে পিস্তল ধরে আছে মোরিং। লোক দু'জন বনহুরকে শুইয়ে দিয়ে তার হাতেপায়ে শিকল বাঁধতে গেলো।

ঐ মুহূর্তে বনহুর দরজার দিকে তাকিয়ে বললো—মিঃ ক্যারিলং আপনি......

অমনি ফিরে তাকালো মোরিং এবং তার সহকারীদ্বয়।

বনহুর সেইদন্ডে লাফিয়ে উঠলো এবং এক ঝটকায় মোরিং-এর হাত থেকে নেড়ে নিলো পিস্তলখানা, তারপর সবাইকে ক্ষুদে কক্ষটার মধ্যে আবদ্ধ করে বেরিয়ে এলো বাইরে। সুড়ঙ্গপথ তার পরিচিত ছিলো না, সে দৌড়ে এগিয়ে চললো সেই কক্ষটার দিকে, যে কক্ষে ক্যারিলং তার পাপীয়সী সঙ্গিনীদের নিয়ে হাস্যরসে কোর কক্ষের দরজায়। ঐ সময় তার কানে গেলো নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার—আমাকে মেরে ফেলো শয়তান, তবু আমার দেহ স্পর্শ করো না—আমাকে তুমি মিস লুনার মত হত্যা করো......তবু আমার দেহ স্পর্শ করো না......

সেই মুহূর্তে বনহুর এসে দাঁড়ালো দরজায়। হাতে তার পিস্তলখানা উদ্যত রয়েছে।

বনহুর দেখলো দিপালীকে আক্রমণ করেছে নপরশু ক্যারিলং। বাঘ যেমন শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনি।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লো—ক্যারিলং......

সঙ্গে সঙ্গে ক্যারিলং দিপালীকে মুক্ত করে দিয়ে ফিরে দাঁড়ালো।

এক সেকেন্ড সময়ও না দিয়ে বনহুর তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

আশ্চর্য, ক্যারিলং চোখের পলকে সরে দাঁড়ালো। সরে দাঁড়াতেই গুলী গিয়ে বিদ্ধ হলো দেয়ালে। সেই সুযোগে ক্যারিলং পা দিয়ে চাপ দিলো মেঝের এক স্থানে। অমনি দেয়ালে একটা দরজা বের হলো। ক্যারিলং সেই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

ক্যারিলং বেশীদূর যেতে পারলো না।

বনহুর তার পেছনে পেছনেই প্রবেশ করলো সেই দরজা দিয়ে ভিতরে।

প্রবেশ করতেই বনহুর শুনতে পেলো ক্যারিলং-এর অট্ট হাসির শব্দ। কিন্তু কোথায় সে, চারিদিকে দেয়াল—কোনো পথ নেই, ক্যারিলং কোন্ পথে উধাও হলো তবে! বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখছে, হঠাৎ তার মনে হলো দু'পাশ থেকে দেয়াল দুটো সরে আসছে।

তখনও ভেসে আসছে ক্যারিলংকোর অদ্ভুত হাসির আওয়াজ।

দু'পাশ থেকে দেয়ালটা সরে আসছে ধীরে ধীরে।

তার সঙ্গে ভেসে আসছে ক্যারিলং-এর হাসির আওয়াজ। বিকট অদ্ভূত সে হাসির শব্দ।

বনহুর বুঝতে পারলো তাকে দেয়াল দিয়ে পিষে মারার অভিসন্ধি নিয়েছে নরপশুর দল। পিছনের দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে বনহুরের অলক্ষ্যে। দু'পাশের দেয়াল এত কাছাকাছি এসে পড়েছে যে বনহুর দু'পাশে হাত বাড়িয়েই নাগাল পাচ্ছিলো।

আরও কাছে সরে আসছে দেয়াল দুটো।

ক্রমে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে বনহুরের।

এবার তাকে সত্যি সত্যি মৃত্যুবরণ করতে হলো......বনহুরের হাতে এখনও পিস্তলখানা ধরা রয়েছে। এবার সে পিস্তলটা ফেলে দিলো মেঝেতে, তারপর দু'পাশের দেয়াল দু'হাত বাড়িয়ে ধরলো।

দেয়াল দুটো এগিয়ে আসছে অদ্ভুত উপায়ে।

আর কিছুটা এলেই বনহুরের দেহটা পিষে থেতলে যাবে—একটা বীভৎস মৃত্যুর জন্য বনহুর প্রস্তুত হয়ে নিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনহুর দেয়াল দুটোকে ঠেকাতে পারে কিনা সেই চেষ্টা করলো।

বনহুর দু'দিকে দু'হাত রেখে দেয়াল দুটোকে ঠেকাতে চেষ্টা করছে। প্রাণপণে দেয়াল চেপে ধরেছে সে, তবু এগিয়ে আসছে দেয়াল দুঠো।

ক্যারিলং-এর হাসির আওয়াজ আরও উৎকট শোনাচ্ছে। কি ভয়ংকর সে হাসি!

বনহুরের সমস্ত দেহ বেয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে।

মাথার উপর একটা মিটার টিক্ টিক্ করে বেজে চলেছে। ওটা কিসের মিটার জানে না বনহুর। এতক্ষণ মিটারখানা তার নজরে পড়েনি। দু'পাশের দেয়াল এগিয়ে আসতেই শব্দটা স্পষ্ট স্থয়ে কানে বাজতে লাগলো।

বনহুর তাকালো উপরের দিকে, হাত দু'খানা তার দু'পাশের দেয়ালে চাপ দিয়ে আছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে বনহুর দেয়াল দুটোকে বাধা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যন্ত্রচালিত শক্তির কাছে দেহের শক্তি পরাজয় বরণ করবেই।

কিন্তু কি আশ্চর্য, দেয়াল দুটো যেন হঠাৎ থেমে গেলো।

ক্যারিলং দেয়ালের ওপাশে তার আসনে বসে গেলে আলোর বলটার মধ্যে সব দেখছিলো। বনহুরের মাথার উপর যে মিটারটা টিক্ টিক্ শব্দ করে বেজে চলেছিলো সেটাই বনহুরের কার্যকলাপের ছবি আলোর বলে প্রতিফলিত করছিলো।

পাশে দাঁড়িয়ে মোরিং ও আরও কয়েকজন লোক।

ক্যারিলং-এর নির্দেশেই মোরিংকো হ্যান্ডেল থেকে হাত সরিয়ে নিলো।

ক্যারিলংকো বললো—একে জীবিত রাখা দরকার। এর শক্তির যে পরিচয় আমি আজ স্বচক্ষে দেখলাম তা অতি বিস্ময়কর। কোনোক্রমে যদি একে আমরা বশীভূত করতে সক্ষম হই তাহলে আমরা বিরাট সাফল্য লাভ করবো।

মোরিং বললো—সে কথা ভেবেই আমরা তাকে সেদিন হত্যা করিনি কিন্তু সুযোগ পেলেই সাপ যেমন ছোবল মারে তেমনি বনহুর আমাদের ঘায়েল করবে।

হাঁ, সে কথা আমি জানি তবু আমার ইচ্ছা ওকে কৌশলে কাজে লাগাবো। কিন্তু সহজে ওকে বাগে আনা যাবে বলে মান হয় না।

ওকে গুম্‌ঘরে বন্দী করে রাখতে হবে যেন পালানোর সুযোগ না পায়।

পালিয়ে যাবে কোথায়? ওর সাধ্য নেই আমাদের এই রহস্যপুরী থেকে সে বের হতে পারে। নিয়ে যাও ওকে, গুম্‌ঘরে বন্দী করে রাখোগে। মনে রেখো, যতদিন সে আপন ইচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার না করে ততদিন তাকে ঐ ঘরেই শিকলে বেঁধে রাখবে।

ক্যারিলং-এর নির্দেশে দেয়াল সরে গেলো আবার যথাস্থানে। বনহুর হাতের পিঠে মাথার ঘাম মুছলো।

ক্যারিলং-এর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো বনহুর—যদি বশ্যতা স্বীকার না করো তাহলে তোমাকে দেয়ালের চাপে পিষে মারবো।

বনহুর মৃদু হেসে আপন মনে বললো—যা বলবে তাতেই রাজি আছি তবু মরতে চাই না, কারণ এখনও আমার কাজ শেষ হয়নি।

ক্যারিলং তার কথাগুলো শুনতে পেলো।

হাসলো ক্যারিলং।

বনহুরকে নিয়ে যাওয়া হলো পুনরায় সেই কক্ষে, যে কক্ষে তাকে প্রথম বন্দী করে রাখা হয়েছিলো।

আবার তার হাত-পা শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হলো।

আবার সেই শয্যা।

বনহুর এখরন কতকটা আশ্বস্ত হয়েছে দিপালী আর রহমান তাহলে এখনও জীবিত আছে। ওদেরকে হত্যা করা হয়নি এটা বুঝতে পারে সে। ওরাও যে তারই সঙ্গে এক সময় বন্দী হয়েছে তাতেও কোনো ভুল নেই। মিস লুনাও ছিলো তাদের সঙ্গে কিন্তু সে আর নেই, তাকে ওরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তার দ্বিখন্ডিত মাথাটা এনে তাকে দেখানো হয়েছে, বলা হয়েছে বিশ্বাসঘাতকার পরিণতি এটা। বারবার মিস লুনার কথা স্মরণ হচ্ছিলো, কারণ মিস লুনা বলেছিলো, আমি নিজের জীবন দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবো। নরশয়তান ক্যারিলং-এর সন্ধান আপনাকে জানিয়ে দেবো। মিস লুনা তাই করেছে......নিজের জীবন দিয়েও সে ক্যারিলং-এর সন্ধান দিয়ে গেলো।

শুয়ে শুয়ে ভাবছে বনহুর অনেক কথা, সেই ভয়ঙ্কর জীবটার কথা, যে জীবটার আকৃতি ছিলো মানুষের মত কতকটা, শুধু চোখ ছিলো একটা, তাই সম্পূর্ণ অদ্ভুত লাগছিলো জীবটাকে। জংলীরা জীবটাকে পূজা করতো এবং তাকে খেতে দিতো কোনো একটা মানুষকে। যেমন তাদেরকে ওখানে বেঁধে রাখা হয়েছিলো ঐ জীবটার খোরাক হিসেবে। ভাগ্যিস, রহমান ঠিক সময়মত এসে হাজির হয়েছিলো এবং কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলো তাই রক্ষা পেয়েছে তারা। জীবটা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাববার সময় ছিলো না বনহুরের, এলোমেলো অনেক চিন্তাই তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। সেই গহন জংগলে মুক্ত হবার পর একটা পাথরখণ্ডের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিলো তারা, ক্লান্ত অবশ দেহটা এলিয়ে দিয়েছিলো সবাই। শুধু ঘুমায়নি বনহুর নিজে কিন্তু এক সময় সেও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো, তারপর আর কোনো কথা স্মরণ নেই। যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন সে নিজেকে দেখলো হাত-পা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়। প্রথমে ভাবতেও পারেনি ক্যারিলং তাদের পিছনেই ছিলো এবং লক্ষ্য করেছিলো তাদের কার্যকলাপ,

সুযোগ বুঝে আটক করে ফেলেছে তাদের সবাইকে। সবচেয়ে বেশি অবাক হচ্ছে বনহুর ক্যারিলং-এর দল কি করে সেই অজানা জঙ্গলে তাদের খোঁজ পেলো? তবে কি মিস লুনাকে অনুসরণ করছিলো তারা?

হঠাৎ বনহুরের কানে ভেসে এলো চাপা নারীকণ্ঠ—রাজকুমার......রাজকুমার......

বনহুর মাথাটা কিছু উঁচু করে তাকালো। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, খুট্ করে আওয়াজ হলো।

একটা কোমল হাতের স্পর্শ অনুভব করলো বনহুর নিজের ললাটে, বললো—কে?

মিষ্টি চাপা কণ্ঠস্বর—আমি দিপালী।

দিপালী তুমি!

হাঁ রাজকুমার। একটুও বিলম্ব করবেন না, হাত-পা বাঁধন মুক্ত হলেই বেরিয়ে পড়ুন।

কিন্তু আমার হাত-পা যে এখনও শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে?

আমি এক্ষুণি খুলে দিচ্ছি! দিপালী অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বনহুরের হাত এবং পা থেকে বাঁধন খুলে দিলো। অবশ্য চাবি সে সংগ্রহ করে নিয়েই এসেছিলো।

দিপালী!

বলুন রাজকুমার?

তুমি কি করে এলে এই বদ্ধ কারাগারে?

সে অনেক কথা, পরে বলবো। এখন তাড়াতাড়ি চলুন।

কিন্তু কি করে যাবো বলো? এখান থেকে বেরুবার পথ তো তোমার আমার কারো জানা নেই। নরপশুদের এটা গোপন আড্ডাখানা। এই আড্ডাখানার পথের যে সন্ধানে আমাকে হয়তো বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো কিন্তু মিস লুনা তার জীবন দিয়ে পথের সন্ধান দিয়ে গেছে।

ও সব কথা ভাববার সময় এখন নেই রাজকুমার, আগে আপনার মুক্তি তারপর সবকিছু......

রহমান কোথায়?

আছে কিন্তু কোথায় তা জানি না। আপনি তাড়াতাড়ি চলুন। চলুন রাজকুমার! দিপালী বনহুরের হাত ধরে টনে নিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে।

অন্ধকারে কিছু নজরে পড়ছে না।

বনহুর বললো—গোটা পাতালপুরীই অন্ধকার দেখছি, ব্যাপার কি?

বললো দিপালী—সব পরে বলবো, আগে চলুন।

দিপালী বনহুরের হাত ধরে দৌড়াতে থাকে।

আশ্চর্য, অন্ধকারেও দিপালী একটুও হোঁচট খায় না বা থমকে দাঁড়ায় না। সে যেন পথ সুন্দরভাবে চিরে রেখেছে। এক টানে তারা বেশ কিছু পথ এসে পড়লো। কিন্তু কোথায় এসেছে তা জানে না বনহুর।

দিপালী আর বনহুর তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে শোনা গেলো ভারী বুটের আওয়াজ।

বেশ কয়েকটা পদশব্দ শোনা গেলো, কে বা কারা যেন দৌড়ে আসছে এদিকে।

বনহুর বললো—ওরা টের পেয়ে গেছে।

দিপালী বললো—ক্যারিলংকো এখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছে? যারা এদিকে আসছে তারা তার সহকারী বা পাহারাদার হবে।

এক্ষুণি এখানে এসে পড়বে।

না, ওরা আমাদের খুঁজে পাবে না, কারণ আমরা এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা সুড়ঙ্গপথের শেষ অংশ। ওরা জানে আমরা যে পথে পালাবো সে পথ এটা নয়......ঐ দেখুন রাজকুমার ওরা ওদিকে চলে যাচ্ছে। ওদের হাতে টর্চলাইট আছে, ওরা আলো ফেলে চারিদিকে দেখছে আর এগুচ্ছে......

বনহুর আর দিপালীর সামনের পথ দিয়ে চলে গেলো ওরা।

আলোকরশ্মিও আর নজরে আসছে না।

দিপালী নিঃশ্বাস ফেলে বললো—যাক্ আমরা এখন নিশ্চিন্ত হলাম। রাজকুমার, যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেটা সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থান কিন্তু এত অপরিসর যে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকাটাও মুশকিল।

হাঁ, তা দেখতেই পাচ্ছি.....কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ এভাবে দাঁড়ানো যাবে আর কতক্ষণ, বলো?

বনহুর আর দিপালী এত ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যে উভয়ে উভয়ের দেহের স্পর্শ অনুভব করছিলো।

এতক্ষণ উভয়ে ছিলো অন্যমনস্ক কিন্তু এখন তাদের মধ্যে সম্বিৎ ফিরে এলো। দিপালী বনহুরের প্রতি যতই অনুরাগিণী থাকুক না কেন, তবু তাকে শ্রদ্ধা করতো, সমীহ করতো, লজ্জাও ছিলো কম নয়। যাকে সে দিনের পর দিন কামনা করে এসেছে, সেই ব্যক্তিকে আজ দিপালী এত কাছে পেয়েছে। এমন করে সে কোনোদিন পায় নি।

বনহুরের দেহের উষ্ণতা দিপালীর মনকে চঞ্চল করে তোলে। আত্মহারা হয়ে যায় দিপালী, সত্যিই বুঝি আজ সে স্বর্গ হাতের মুঠায় পেয়েছে কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে পা দু'খানা?

বনহুর তখন ভাবছিলো যারা চলে গেলো টর্চের আলো ফেলে, তারা যদি পুনরায় ফিরে আসে এবং টর্চের আলো যদি এদিকে ফেলে তাহলে কিভাবে নিজকে রক্ষা করবে আর কি করেই বা রক্ষা করবে দিপালীকে। কোনো অস্ত্র নেই এখন তার কাছে। অপরিসর জায়গা—লড়াই করবার মত জায়গা এটা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ জায়গায় কেউ ফিরে এলো না।

সমস্ত আড্ডাখানা ওরা চষে বেড়াচ্ছে অথচ এদিকে কেউ এলো না।

দিপালীর পা দু'খানা অবশ হয়ে আসছিলো, কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকবে। এক সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে দিপালী। ওর চোখ দুটো মুদে আসে আপনা আপনি।

বনহুর বুঝতে পারে দিপালীর খুব কষ্ট হচ্ছে, পা দু'খানা শিথিল হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে এগিয়ে আসছে ওর মাথাটা।

বনহুর বললো—দিপালী, এভাবে কতক্ষণ কাটানো যাবে বলো?

এ ছাড়া যে উপায় নেই রাজকুমার, কারণ আমি জানি এটাই আমাদের জন্য একমাত্র নিরাপদ স্থান।.

চুপ, ঐ যে আবার টর্চের আলো এদিকে আসছে। ভারী বুটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে...

সত্যিই একটা আলোর ছটা এগিয়ে আসছে এবং তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে ভারী বুটের শব্দ। নিশ্চয়ই ওরা আবার এগিয়ে আসছে এদিকে। ওদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে। ওরা যে ব্যস্তভাবে বনহুর ও দিপালীর সন্ধান করে ফিরছে, তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

বনহুর আর দিপালী রুদ্ধ বিশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলো, এবার ওরা তাদের দু'জনকে খুঁজে বের না করে ছাড়বে না।

কিন্তু কিছুতেই বনহুর এবার ধরা দেবে না। এবার বন্দী হলে মুক্তির আশা নেই এবং দিপালীকে ওরা হত্যা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো মিস লুনাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে ঐভাবেই হত্যা করবে ওরা দিপালীকে, কারণ দিপালীই যে তাকে বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। মিস লুনার স্মৃতিগুলো বনহুরকে বিচলিত করে তোলে। ওর কথাগুলো কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। মিষ্টি মধুর হাসি ভেসে উঠে চোখের সামনে। বনহুরের চোখ দুটো ছলছল করে উঠে, এত বিপদেও মনকে স্থির রাখতে পারে না বনহুর।

দিপালী বলে উঠে—যাক বাঁচা গেলো, ওরা কিন্তু চলে গেলো আবার আমাদের সামনে দিয়ে।

হাঁ, তাই তো দেখছি...কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। দিপালী বসো, আমিও বসছি কোনোরকমে।

কিন্তু...এতটুকু জায়গায় দু'জন দাঁড়ানোই কষ্টকর, আপনি আর আমি বসবো কি করে?

হবে বসো...কথাটা বলে বনহুর বসলো।

দিপালীর পা দু'খানা এত অবশ লাগছিলো যে সে মোটেই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো না। কিন্তু অন্য কেউ নয়—সর্দার!

দিপালী দ্বিধা বোধ করছিলো, তাই বনহুর বললো আবার—বসো দিপালী।

অগত্যা বসলো দিপালী।

জড়োসড়ো হয়ে বসতে গিয়ে একেবারে বনহুরের দেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে রসতে হলো। দিপালী একদিন রাজকুমারকে নিবিড়ভাবে পাবার জন্য উন্মুখ ছিলো আজ সেই রাজকুমারকে একান্ত নিবিড় করে পেয়েছে। বুকটা ওর টিপ্ টিপ্ করছে, এই ভীষণ বিপদ মুহূর্তেও তার মনে এক সীমাহীন আনন্দ লহরী বয়ে যাচ্ছিলো। এমনি করে সে যুগ যুগ যদি রাজকুমারকে পাশে পেতো তাহলে সে স্বর্গবাসিনী মনে করতো।

বনহুর বললো—খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার, তাই না দিপালী?

না, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না রাজকুমার।

আর হলেই বা বলে কি হবে, জানি তাই তো তুমি নীরব রয়েছো। দিপালী, তোমার সহায়তায় আমি এদেরকে শায়েস্তা করতে পারবো বলে আশা করছি।

রাজকুমার! অস্ফুট ধ্বনি করলো দিপালী।

কিছুক্ষণ নীরব কাটলো ওদের।

কখন যে দিপালীর চোখে ঘুম নেমে এসেছিলো তা বুঝতে পারেনি দিপালী। নিজের অজ্ঞাতে তার অবশ দেহটা এলিয়ে দিয়েছে বনহুরের কোলের উপর তাও সে জানে না।

বনহুর কিন্তু ঘুমাতে পারেনি, তার নিদ্রাহীন চোখ দুটো অন্ধকার ভেদ করে দিপালীর ঘুমন্ত মুখে এসে পড়লো। কিছু নজরে পড়লো না তার, শুধু ক্লান্তি আর অবসাদভরা নিঃশ্বাসের শব্দ তার কানে প্রবেশ করছে। অনাবিল শান্তির কোলে ঢলে পড়েছে দিপালী।

বনহুর নিশ্চুপ রইলো, বারবার তার হাত দু'খানা দিপালীর দেহটাকে তুলে ঠিকভাবে শুইয়ে দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু বনহুর নিজকে সংযত করে রাখলো—না, ওকে সে নিজে স্পর্শ করবে না। একটা অসহায় নারীর প্রতি সে করুণা করতে পারে, কিন্তু.....

বনহুর দিপালীর দেহটাকে আস্তে নামিয়ে শুইয়ে দেয় মেঝেতে, তারপর সে উঠে দাঁড়ালো অতি সন্তর্পণে।

দিপালী এত অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো যে, একটুও সে বুঝতে পারলো না, তাকে বনহুর তার কোল থেকে নামিয়ে রাখলো মেঝেতে।

বনহুর খুব সাবধানে এগিয়ে চললো সুড়ঙ্গপথ ধরে।

একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে সুড়ঙ্গমধ্যে। এখনও বনহুরের কানে ভেসে আসছে দিপালীর নিঃশ্বাসের শব্দ।

এগুচ্ছে বনহুর।

সম্মুখে একটা ফাটল।

অবাক হলো বনহুর, তারা যখন এপথে আসছিলো তখন এ ফাটলটা তো নজরে পড়েনি। ফাটলটা প্রায় চার হাত প্রশস্ত, এই ফাটল পেরিয়ে ওপারে যাওয়া কঠিন। যে কোনো মুহূর্তে ফাটলে পড়ে যাবার ভয় রয়েছে।

বনহুর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছিলো তাই রক্ষা, দ্রুত এগুলে পড়ে যেতো ফাটলের ভিতরে। ঐ ফাটলের গভীর অতলে কি আছে কে জানে। ফাটলখানা যেন অতি সূক্ষ্মভাবে দু'অংশকে ঠিক আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করে ফেলা হয়েছে।

একটুর জন্য বেঁচে গেলো বনহুর।

একে অন্ধকার তারপর পায়ের তলায় ফাটল। দাঁড়িয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করলো বনহুর। অনেকক্ষণ জমাট অন্ধকারে থাকায় বনহুর অন্ধকারেও বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো। দেখতে পাচ্ছিলো ফাটলটা আরও অন্ধকার, যেন একটা বিরাট কালো রেখা পড়ে আছে মেঝেতে।

বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করছিলো এটা কি? কিসের ফাটল এটা? কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ভেবেও কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না। বুঝতে পারলো শয়তান কুচক্রী দলের এটা একটা বিরাট ফাঁদ। লাফিয়ে ওপাশে যেতে পারতো বনহুর, কিন্তু সে তা করলো না। ফিরে এলো দিপালীর পাশে।

তেমনি অঘোরে ঘুমাচ্ছে দিপালী।

তার নিঃশ্বাসের স্পষ্ট শব্দ শুনতে পাচ্ছে বনহুর। এত বেশি ক্লান্ত অবশ হয়ে পড়েছে সে যে, কোনো কিছুই জানতে পারেনি দিপালী।

বনহুর আর এগুনো সমীচীন মনে করলো না, দিপালী যেভাবে ঘুমাচ্ছে তেমনি ঘুমাক। বনহুর দিপালীর কাছ থেকে বেশ কিছু দূরে বসে পড়লো, হেলান দিলো সে সুড়ঙ্গপথের দেয়ালে। দিপালীর নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে, বনহুর চোখ বন্ধ করলো, কিন্তু ঘুম তার চোখে আসছে না।

ভাবছে বনহুর কত কথা...মিস লুনাকে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না, কারণ মিস লুনার নৃশংস মৃত্যু তাকে ভীষণ বিচলিত করে তুলেছে।

অনেক কথাই বনহুর ভাবছিলো, হঠাৎ কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, হয়তো বা একটু ঘুমিয়েই পড়ে সে।

হঠাৎ একটা শব্দ তার কানে ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলো বনহুর, শব্দটা কোন্‌দিক থেকে আসছে ভালভাবে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো ঐ ফাটলটার মধ্য থেকেই শব্দটা আসছে।

একটা অদ্ভুত ধরনের সাঁ সাঁ সোঁ সোঁ আওয়াজ। বনহুর সরে গেলো দিপালীর কাছাকাছি। হঠাৎ যদি কোনো বিপদ আসে দিপালীকে রক্ষা করার চেষ্টা তাকে করতে হবে। দিপালীর ঘুম ভাঙেনি, সে এখনও একইভাবে ঘুমিয়ে চলেছে, তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বনহুর দিপালীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো, দৃষ্টি তার সম্মুখে সেই ফাটলটার দিকে। ঐ ফাটলটা থেকেই যে শব্দটা আসছে তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ফাটলটার দিকে। অবশ্য কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না, তবু সে তাকিয়ে ছিলো ঐ দিকে। কান দুটো সজাগ রেখেছিলো বনহুর, শব্দটা ঠিক ঐ ফাটলের মধ্য থেকেই আসছে কিনা সেটা ভালভাবে লক্ষ্য করছিলো। হঠাৎ একটা আলোকরশ্মি বেরিয়ে এলো ফাটলের ভিতর থেকে—তীব্র নয়, নীলাভ রশ্মি।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো, ভালভাবে লক্ষ্য করছে সে।

শব্দটা এখন আরও তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি দিপালীর দেহে হাত রেখে চাপাকণ্ঠে ডাকলো বনহুর—দিপালী দিপালী......

দিপালী ধড়মড় করে উঠে বসলো।

শব্দটা কানে যেতেই কথা বলতে যাচ্ছিলো দিপালী, বনহুর অমনি তার মুখে হাতচাপা দিয়ে বললো—চুপ!

দিপালী ভয় পেয়ে গিয়েছিলো ভীষণ, তার দেহটা কেঁপে উঠলো বারবার, বললো—কি হয়েছে রাজকুমার?

বললো বনহুর—চুপ করে দেখো। আমাদের ভাগ্যে এখন কি আছে কে জানে।

জানি না কেন আমার বুকটা কাঁপছে।

কোনো ভয় নেই, মরতে হয় মরবো!

দিপালী বললো—আমি মরতে ভয় পাই না রাজকুমার। শুধু ভাবছি ওরা আপনাকে যদি গ্রেপ্তার করে হত্যা করে?

মৃত্যু যখন একদিন হবেই তাতে এত ভাবার কি আছে!

রাজকুমার, আপনাকে মরতে দেবো না আমি।

দিপালী, ঐ দেখো...আলোকরশ্মি যেন বাড়ছে।

রাজকুমার...কথা শেষ না করেই দিপালী বনহুরের কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়।

ওরা উভয়ে তাকায় ঐদিকে যেদিক থেকে আলোকরশ্মি এবং শব্দটা ভেসে আসছিলো। বিস্ময়ভরা চোখে দেখে, শুধু আলোকরশ্মি নয়, তার সঙ্গে একটা অদ্ভুত বস্তু উঠে এলো উপরে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বস্তুটার মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসছে আলোকরশ্মি। বস্তুটার সম্মুখের এবং পিছন অংশের ফুটো দিয়েই আলোকরশ্মিটা ছড়িয়ে পড়ছিলো।

বস্তুটা উপরে উঠে আসতেই শব্দটা থেমে গেলো। আলোকরশ্মির আলোতে বনহুর আর দিপালী দেখতে পাচ্ছে, যে ফাটলটার মধ্য হতে বস্তুটা বেরিয়ে এলো সেই ফাটলটা এখন আর নেই। বস্তুটার সম্মুখের দরজা খুলে গেলো, বস্তুটার ভিতর থেকে নেমে দাঁড়ালো দুটি প্রাণী—তবে প্রাণী না যন্ত্রচালিত কোনো মেশিন ঠিক বোঝা গেলো না।

দিপালী বিস্মিত কণ্ঠে বললো—ও দুটো কি রাজকুমার?

বনহুর বললো—আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।

বনহুর আর দিপালী যখন বস্তু দুটোকে বিস্ময়ভরা চোখে দেখেছিলো তখন বস্তুটার পাশে দু'জন মানুষ এসে দাঁড়ালো।

আলোকরশ্মির আলোতে দেখা গেলো যারা এসে দাঁড়ালো তারা একজন ক্যারিলং অপরজন মোরিংকো, তারা এসে দাঁড়াতেই অদ্ভুত পোশাকপরা প্রাণী বা মেসিন দু'টির মুখের আবরণ খুলে গেলো।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো বনহুর—মিসেস এলিনা জীবিত......বনহুরের চোখের সামনে মুহূর্তে ভেসে উঠলো সেই জুব্রা নদের তলদেশে ডুবুজাহাজের অভ্যন্তরে হাজারো মেসিনাদির মধ্যে মিসেস এলিনার মৃতদেহ বিকৃত বীভৎস খণ্ডবিখণ্ড......আর ভাবতে পারে না বনহুর, কি করে মিসেস এলিনা জীবিত থাকতে পারে?

অপরজন সম্পূর্ণ পরিচিত ব্যক্তি।

বনহুর ও দিপালী স্তব্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। এদিকটা জমাট অন্ধকার তাই তাদের দেখা যাচ্ছে না বা ওরা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু বনহুর আর দিপালী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সব কিছু।

মিসেস এলিনা কিভাবে জীবিত থাকতে পারে এটাই বড় আশ্চর্য। বনহুর জানে, সেই কঠিন হ্যান্ডেলে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে ডুবুজাহাজখানার বিস্ফোরণ ঘটেছিলো। সেকি ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার বজ্রনিনাদ শব্দ। গভীর জলতলদেশে সেকি ভীষণ তান্ডবলীলা। সেই ধ্বংসলীলাকে পরিহাস করে বেঁচে আছে মিসেস এলিনা। বনহুর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না যেন। মিসেস এলিনার সঙ্গীর দেহেও যেমন পোশাক তেমন পোশাক তার নিজের দেহেও।

মিসেস এলিনা নিজের মুখের আবরণ খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীটিও খুলে ফেলেছিলো তার নিজের মুখের আবরণ।

ক্যারিলং-এর কথায় মিসেস এলিনা তার খোলসের মধ্য থেকে বের করে আনলো একটা কৌটা। কৌটাখানা ক্যারিলং-এর হাতে দিলো মিসেস এলিনা। সেও কিছু বললো, তাও শোনা গেলো না বা শুনতে পেলো না বনহুর এবং দিপালী।

আলোকরশ্মিতে দেখা গেলো কৌটাখানার মুখে ঢাকনা আছে।

মিসেস এলিনার হাত থেকে কৌটাখানা নিয়ে তার ঢাকনা খুলে ফেললো ক্যারিলং। চোখ মুখে তার বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হলো।

বনহুর চাপাকণ্ঠে বললো—বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ কৌটাখানার মধ্যে। দেখছোনা দিপালী, মিসেস এলিনা কৌটাখানা কত যত্ন সহকারে নিজ দেহের অভ্যন্তরে করে এনেছে।

দিপালীও তেমনি মৃদুকণ্ঠে বললো—মিস এলিনার মৃত্যু ঘটেছিলো, এটাই আমি জানতাম......

হাঁ, আমিও তাই ভেবেছিলাম কিন্তু এখন সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। মিসেস এলিনা কি করে জীবিত রইলো ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি আমি....

দিপালী বলে উঠলো—ঐ দেখুন, মিসেস এলিনা যে কৌটাখানা ক্যারিলং-এর হাতে দিলো সেটার ঢাকনা খুলে ফেললো।

বনহুর বললো—ওর মধ্যে এমন কোনো জিনিস আছে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দিপালী আর বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলো সেই অদ্ভুত বাহনটাকে আর তার যাত্রীদ্বয়কে। এ ছাড়াও ক্যারিলং ও মিঃ মোরিংও ছিলো তাদের লক্ষ্য।

মিসেস এলিনার হাত থেকে কৌটাটা নিয়ে ক্যারিলং ঢাকনা খুলে ফেললো এবং তার ভিতর থেকে বের করলো একটা কাগজ। কাগজখানা যত্ন সহকারে ভাঁজ করা ছিলো।

ক্যারিলং কাগজখানা খুলে ধরে মনোযোগ সহকারে দেখলো। চোখ দুটো তার খুশিতে জ্বলজ্বল করছে।

কাগজখানা ভাঁজ করে রাখলো ক্যারিলং ঐ কৌটাখানার মধ্যে, তারপর কিছু বললো, সঙ্গে সঙ্গে মিসেস এলিনা ও অপর ব্যক্তিটি মুখের আবরণ টেনে নিলো। মুহূর্ত বিলম্ব না করে তারা উঠে পড়লো সেই বিস্ময়কর বাহনটার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নীলাভ আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে, তারপর ঐ ফাটলটার মধ্যে অদৃশ্য হলো।

ফাটলটা পূর্বের ন্যায় সমতল হয়ে গেলো, কেউ বুঝতে পারবে না ঐ স্থানে কোনো ফাটল বা ফাঁক ছিলো।

ক্যারিলং ও তার সঙ্গী কৌটাখানা সহ চলে গেলো সেখান থেকে। তারা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ও দিপালী এসে দাঁড়ালো সেখানে।

বনহুর বললো—আশ্চর্য, আর একটা রহস্যজাল ছড়িয়ে পড়লো আমার সম্মুখে, ঐ কোটাখানার মধ্যে কিসের দলিল রয়েছে এটা আমাকে দেখতেই হবে।

দিপালী বললো—কিন্তু আমাদের চারিদিকে বিপদ ওৎ পেতে আছে, এক পাও এগুনোর উপায় নেই।

হাঁ, সে কথা সত্য দিপালী। প্রতিমুহূর্তে আমরা বিপদে পড়তে পারি। কিন্তু উপায় নেই, আমাকে দেখতেই হবে ঐ দলিলখানা কিসের? দিপালী, তুমি এইস্থানে অপেক্ষা করবে। আমার মনে হয় এই স্থান নিরাপদ, কারণ আমি লক্ষ্য করেছি ওরা ভুল করেও কেউ এদিকে এলো না। তুমি অপেক্ষা করো, আমি ক্যারিলংকে দেখে আসি কৌটাখানা নিয়ে সে কোথায় পৌঁছেছে!

দিপালী কোনো কথা বললো না।

বনহুর চলে গেলো।

দিপালী ফিরে এলো সেই স্থানে যেখানে সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলো। মনে মনে সে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে লাগলো। তার রাজকুমার আবার কোন্ বিপদের সম্মুখীন হয় কে জানে।

বনহুর কিছুটা এগুতেই কানে ভেসে এলো চাপা কণ্ঠস্বর। দু'তিন জনের মিলিত কণ্ঠস্বর। অতি সন্তর্পণে বনহুর উঁকি দিলো। দেখতে পেলো, ক্যারিলং কৌটা থেকে বের করেছে সেই ভাঁজকরা কাগজখানা। মেলে ধরেছে টেবিলে, আংগুল দিয়ে সে কাগজখানার এক স্থানে দেখিয়ে কিছু বললো।

সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীরা মিলিত কণ্ঠে কিছু উচ্চারণ করলো। বনহুর সংকেতপূর্ণ কথার একটিও বুঝতে পারলো না।

কাগজখানা যে একটি ম্যাপ তাতে কোনো ভুল নেই। বনহুর বেশ বুঝতে পারলো ম্যাপখানা অত্যন্ত মূল্যবান। মিসেস এলিনা ম্যাপখানা বহন করে এনেছিলো সেই অদ্ভুত বাহনে করে।

বনহুর আত্মগোপন করে সব লক্ষ্য করতে লাগলো।

ক্যারিলং কৌটাখানা অতি সাবধানে লুকিয়ে ফেললো নিজ পোশাকের কোনো এক গোপন স্থানে। পাশেই ছিলো একটা সুইচ, ঐ সুইচে হাত

রাখতেই যে স্থানে দাঁড়িয়েছিলো ক্যারিলং ঐ স্থানে খানিকটা মেঝে সহ নেমে চললো সে নিচের দিকে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে কক্ষে প্রবেশ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে যারা ছিলো তার বনহুরকে দেখামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

বনহুর ঘুষির পর ঘুষি লাগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাহিল করে ফেললো ক্যারিলং-এর অনুচরগণকে। মরিয়া হয়ে উঠলো তারা, কে কোন্ দিকে পালাবে পথ পেলো না। বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুইচটা টিপলো, যে সুইচটা টিপে ক্যারিলং উধাও হলো পাতাল পুরীর দিকে।

বনহুর সুইচে হাত রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই লিফট খানা সাঁ সাঁ করে উপরে উঠে আসতে লাগলো। একটা শব্দ হচ্ছে অবিরত, একটানা।

বনহুর প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো, সে বেশ বুঝতে পারলো, সুইচটা অন্ করার সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটা উঠে আসবে উপরের দিকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, ক্যারিলং সোজাসুজি এসে হাজির হলো বনহুরের সম্মুখে।

ক্যারিলং বনহুরকে দেখেই চিৎকার করে উঠলো!

বনহুর ওকে ভাববার সময় না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো ক্যারিলং-এর চোয়ালে।

মেঝেটা কিন্তু পূর্বের ন্যায় সমতল হয়ে গেছে, এখন বুঝবার উপায় নাই যে ঐখানে কোনো লিফট জাতীয় বস্তুর সংযোজন রয়েছে।

বনহুরের ঘুষি খেয়ে ক্যারিলং পড়ে গেলো মেঝেতে। গড়িয়ে পড়লো তাজা লাল টকটকে রক্ত তার চিবুক বেয়ে। কিন্তু কৌটাখানা এখন তার হাতে নেই, জামার ভিতরে গোপন কোনো পকেটে রয়েছে।

ক্যারিলং হাতের পিটে চিবুকের রক্ত মুছে চোখের সামনে হাতখানা তুলে ধরে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখলো, তারপর বাঘ যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি ক্যারিলং উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।

বনহুর টাল সামলে নিয়ে কঠিন হাতে চেপে ধরলো ক্যারিলং-এর টাই সহ জামার কলার, তারপর প্রচন্ড এক ঘুষি মারলো তার নাকে।

নাক কেটে রক্ত ঝরে পড়লো।

ক্যারিলং দেয়ালে এসে ছিটকে পড়লো, দেয়াল ধরে টাল সামনে নিলো সে অতি কষ্টে।

ক্যারিলং-এর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। বনহুরেরও কম নয়। বাঘ ও সিংহের লড়াই শুরু হলো। ওদিকে ততক্ষণে এসে গেছে ক্যারিলং- এর দলবল।

তারা চারপাশ থেকে বনহুরকে ঘিরে ধরলো।

এক এক জনের হাতে এক এক ধরনের অস্ত্র। সবাই অস্ত্র বাগিয়ে ধরেছে।

বনহুরের কোনোদিকে খেয়াল নেই, সে ক্যারিলংকে লক্ষ্য করে ঘুষির পর ঘুষি চালিয়ে চলছে।

ক্যারিলং মেঝেতে পড়ে গিয়ে তাকালো। তার চারপাশে তার সহচরগণ এসে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবার হাতেই অস্ত্র, ক্যারিলং মনে ভরসা পেলো। সে নব উৎসাহে পুনরায় আক্রমণ করলো বনহুরকে।

বনহুরের এবার হুঁশ্ হলো, দেখলো তার চারপাশে শত্রুপক্ষের লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একচুলও নড়বার জো নেই তার। সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। একবার সে তাকিয়ে দেখে নিলো ঐ সুইচটা, যে সুইচে হাত রাখতেই মেঝেটা উঠে এসেছিলো উপরে এবং ক্যারিলংও হাজির হয়েছিলো সেই সঙ্গে।

ততক্ষণে ক্যারিলংও উঠে দাঁড়িয়েছে।

ক্যারিলং বাম হাতের পিঠে ঠোঁটের রক্ত মুছে নিচ্ছিলো বার বার।

ক্যারিলং-এর দিকে তাকিয়ে আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলো তার দলবল কিন্তু সে সুযোগ দিলো না বনহুর, ওরা আক্রমণ করবার পূর্বেই সে এক লাফ দিয়ে মেঝের ঐ স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করে সুইচ টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটার কিছু অংশ সাঁ সাঁ করে নেমে চললো নীচে।

ক্যারিলং ও তার দল সেই দণ্ডে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো যেন। তারা হাবা বনে গেলো কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য, ক্যারিলং দ্রুত সুইচটা অন্ করে দিলো।

এবার লিফটখানা পুনরায় উপরের দিকে উঠে আসতে লাগলো।

প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো ক্যারিলং ও তার দল। এবার বনহুরকে তারা পেলে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যেকের চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে যেন। সবার হাতেই অস্ত্র, তারা অস্ত্র বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মেঝেসহ লিফট এসে দাঁড়ালো পূর্বের সেই স্থানে।

কিন্তু একি, বনহুর তো নেই!

সবার চোখে বিস্ময়, তারা তাকালো এ ওর মুখের দিকে।

ক্যারিলং ও তার দলবল যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো তাদের কয়েকজন মেঝের ঐ অংশে এসে দাঁড়ালো এবং সুইচে চাপ দিলো।

অমনি নেমে চললো মেঝের সেই অংশটা যে অংশে দাঁড়িয়ে বনহুর নেমে গিয়েছিলো নিচে।

ক্যারিলং সঙ্গীদের সহ নেমে এলো নিচে, চারিদিকে নানা ধরনের মেসিনাদি এবং কয়েকটা অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র। ক্যারিলং ও তার সহকারীরা মেসিনাদির আশেপাশে তীক্ষ্ণভাবে সন্ধান চালিয়ে চললো।

বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ক্যারিলং-এর সঙ্গীরা।

সবার হাতেই মারাত্মক অস্ত্র রয়েছে।

প্রত্যেকেই উদ্যত অস্ত্র নিয়ে অনুসন্ধান করে ফিরছে বনহুরের। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছে না তারা।

সঙ্গীদের কারও কারও হাতে রয়েছে তীব্র আলোযুক্ত টর্চলাইট। লাইটের আলো ফেলে খুঁজে চলেছে ক্যারিলং ও তার দলবল।

কিন্তু কোথায় বনহুর!

ওদিকে দিপালী হাঁপিয়ে উঠছে।

দুশ্চিন্তায় ভরে উঠেছে তার মন, এই আসবো বলে গেলো, কিন্তু এতক্ষণও এলো না কেন। তবে কি কোনো বিপদে পড়েছে রাজকুমার? কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব দেবে কে!

কিছুক্ষণ পূর্বে তার দু'চোখে গভীর ঘুম নেমে এসেছিলো আর তখন তার চোখে একটুও ঘুম আসছে না। মনটা তার অস্থির হয়ে উঠেছে, তবে কি ফিরে আসবে না আর সে?

দিপালীর চোখ মুখম্লান বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। ভয়ও হচ্ছে মনে, হঠাৎ যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে তাহলে নির্ঘাত মৃত্যু। নিজকে সে কিছুতেই সংযত রাখতে পারছিলো না, কিন্তু কি করবে, যেদিকে যাবে সেইদিকেই বিপদ ওৎ পেতে আছে। মনে পড়লো রহমানের কথা, বেচারা কোথায় কে জানে। জীবিত আছে কিনা তাও জানে না সে।

নানা ধরনের চিন্তা করে চলছে দিপালী।

নীড়হারা পাখির মত কাঁপছে তার দেহটা, ক্যারিলং-এর সেই হিংস্র চেহারা তাকে ভীষণ ঘাবড়ে তোলে।

হঠাৎ চমকে উঠলো দিপালী, একটা তীব্র আলোকছটা এসে পড়লো। বুকটা কেঁপে উঠলো দিপালীর, ভয়বিহ্বল চোখে তাকালো সে সম্মুখে।

ভূত দেখার মত চমকে উঠলো দিপালী।

মোরিং ও আর একজন শয়তান দাঁড়িয়ে আছে সুড়ঙ্গপথের মাঝামাঝি। টর্চের আলো চোখে পড়ায় দিপালী স্পষ্ট দেখতে পেলো না বটে তবু অনুমানে বুঝতে পারলো সে ওদের কাছে ধরা পড়ে গেছে।

মোরিং ও তার সাথী আরও দু'পা এগিয়ে এলো।

দিপালীকে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখে মোরিং অট্টহাসি হেসে উঠলো।

সে হাসির শব্দে সুড়ঙ্গপথ থরথর করে কেঁপে উঠলো যেন। দিপালীর অন্তরাত্না শিউরে উঠলো।

মোরিং হাসি থামিয়ে দাঁত পিষে বললো—সুন্দরী, আমাদের চোখে ধুলা দিয়ে পালাবে ভেবেছিলে, তাই না?

দিপালী কাঁপছে, চোখেমুখে তার ফুটে উঠেছে অসহায় ভাব। এমন অবস্থায় সে পড়েনি কোনোদিন।

মোরিং টর্চের আলো ধরে সোজাসুজি এসে দাঁড়ালো ঠিক দিপালীর পাশে এবং বাম হাতে চেপে ধরলো তার হাতখানা। দিপালী চিৎকার করে উঠলো—না, না, আমাকে ধরো না। আমাকে ধরো না তোমরা......

মোরিং ও তার সহচর খিলখিল করে হেসে উঠলো, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মোরিং তাকে টেনে নিলো কাছে।

টেনে হিঁচড়ে দিপালীকে ওরা নিয়ে এলো ওদের গোপন কামরায়।

দিপালী চোখ মেলে তাকালো চারিদিকে।

দরদর করে ওর দেহ থেকে ঘাম ঝরছে।

চারপাশে পাষাণ প্রাচীর, কক্ষে একটা লালচে আলো জ্বলছে। দেয়ালে নানা ধরনের নগ্ন ছবি। সম্মুখে দৃষ্টি ফেলতেই দেখলো দিপালী ভীষণ চেহারার একটা মূর্তি। অপরদিকে নজর পড়তেই দেখলো একটা হিংস্র বাঘ হা করে আছে। তার মুখগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে লেলিহান অগ্নিশিখা।

দিপালীর বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠলো।

তার হাতের কব্জিতে এখনও মোরিং-এর হাত চেপে বসে আছে। দিপালী অসহায় দৃষ্টি নিয়ে চারপাশে দেখছে। সেকি ভয়ঙ্কর এক অবস্থা, দিপালীর ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হলো।

কিন্তু কেঁদে কি হবে, নিজেকে রক্ষা করতেই হবে যে কোনো উপায়ে। দিপালী গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে কি করে রেহাই পাবে সে।

মোরিং বলে উঠলো—সুন্দরী, এবার বলো কে বাঁচাবে তোমাকে, কোথায় তোমার সেই বন্ধু?

দিপালী নীরব।

দু'চোখে তার অসহায় চাহনি।

মোরিং ও তার সঙ্গীটা দিপালীকে নিয়ে শুরু করলো তামাসা। নানা ধরনের কুৎসিত ইংগিতপূর্ণ উক্তি তারা উচ্চারণ করে চললো।

দিপালীকে মোরিং তুলে বসিয়ে দিলো মাঝখানের টেবিলে।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে দিপালী। রক্তশূন্য মুখে তাকাচ্ছিলো সে দরজার দিকে। কেউ যদি এই মুহূর্তে এসে পড়তো তাহলেও হয়তো রক্ষা পেতো দিপালী এই নরপশু দুটির কবল থেকে।

মোরিং আর তার সঙ্গী টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করলো মদের বোতল আর দুটি কাঁচপাত্র।

ঐ সময় টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে দৃষ্টি চলে গেলো দিপালীর। সে দেখতে পেলো টেবিলের ড্রয়ারের আছে একটা পিস্তল। পিস্তলখানার উপর নজর পড়তেই দিপালীর বুকে একটা আশার আলো উঁকি দিয়ে গেলো। ঐ পিস্তলখানাকে একজন বন্ধু বলে মনে হলো এই মুহূর্তে দিপালীর কাছে। সে এবার হেসে উঠলো খিলখিল করে।

দিপালীকে হঠাৎ হাসতে দেখে অবাক হলো মোরিং ও তার সঙ্গী নরপশুটা। ওরা প্রথমে বিস্মিত হলো বটে কিন্তু পরক্ষণেই স্বাভাবিক হলো, ভাবলো সুন্দরী এবার তাদের প্রতি সদয় হয়েছে।

মোরিং গলার স্বর নরম করে বললো—প্রিয়, এতক্ষণে বুঝি হুঁশ্ হলো তোমার? চিবুকটা উঁচু করে ধরলো সে দিপালীর।

দিপালী তখনও হেসে চলেছে।

অপর ব্যক্তি বোতল থেকে মদ ঢেলে নিয়ে গলায় ডেলে দিলো, তারপর বললো—তুমি যদি আমাদের বাহুবন্ধনে নিজেকে বিলিয়ে দাও তাহলে রাজরাণী হবে, বুঝলে?

দিপালী হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে ফেলে বললো—বুঝতে পেরেছি বলেই তো হাসছি!

সত্যি?

তবে কি মিথ্যা বলছি। দিপালী টেবিল থেকে নেমে দাঁড়ালো।

মোরিং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলো দিপালীর দিকে। সে হাসছে, ঐ হাসির মধ্যে কোনো ছলনা আছে কিনা তাই সে দেখছে মনোযোগ সহকারে।

দিপালী নিখুঁত অভিনয় করে চললো।

দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো দিপালী মোরিং-এর গলা।

মোরিং যেমনি দিপালীকে বেষ্টন করে ধরতে গেলো অমনি দিপালী সরে এলো, বললো—উঁহুঁ এখন নয়......আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো মোরিং-এর সঙ্গীটাকে।

মোরিং-এর সঙ্গীটার চোখে তখন রঙিন নেশা।

সেও উদগ্রীব হয়ে উঠেছে দিপালীকে পাবার জন্য। গেলাসের পর গেলাম মদ সে পান করে যাচ্ছে আর জড়িত গলায় দিপালীকে নানাভাবে সম্বোধন জানাচ্ছে।

দিপালী আংগুল দিয়ে যেমনি ওকে দেখিয়ে দিলো অমনি মোরিং ওকে নির্দেশ দিলো বেরিয়ে যেতে।

কিন্তু মোরিং-এর সহচর বেরিয়ে না গিয়ে পুনরায় বোতল থেকে মদ ঢালতে লাগলো খালি কাঁচপাত্রটার মধ্যে।

মোরিং তখন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—বেরিয়ে যাও দোস্ত, নাহলে কিন্তু......মোরিং-এর হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো।

সহচরটা কাঁচপাত্র পূর্ণ করে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলো মোরিং-এর দিকে।

মোরিং কাঁচপাত্র হাতে না নিয়ে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো দরজার দিকে—বেরিয়ে যাও দোস্ত।

কি...কি বললে মোরিং, আমি বেরিয়ে যাবো?

হাঁ!

কখনও না। শিকার যখন আমরা দু'জনই খুঁজে পেয়েছি তখন ওর উপর আমাদের দু'জনেরই সমান অধিকার আছে। ওকে আমি চাই, তুমিই বরং বেরিয়ে যাও মোরিং।

কি, এত সাহস তোমার আমাকে তুমি বেরিয়ে যেতে বলছো!

হাঁ, তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলছি......

দিপালী তখন মোরিং-এর জামার আস্তিন মুঠায় চেপে ধরে বললো—না, তোমাকে আমি যেতে দেবো না। আমি তোমাকে যেতে দেবো না। আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি......

মোরিং-এর সহচরের মনে প্রতিহিংসার বহ্নিশিখা জ্বলে উঠলো। সে ক্রুদ্ধ শার্দুলের মত ফোঁস করে উঠলো, বললো—ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।

নাঃ কিছুতেই তা দেবো না। মোরিং বলিষ্ঠ মুঠায় ধরে আছে ওর হাত। দিপালীকে নিয়ে চললো তর্কবিতর্ক।

তারপর শুরু হলো যুদ্ধ।

যা চেয়েছিলো দিপালী তাই হলো।

যখন মোরিং আর তার সহচর মল্লযুদ্ধ শুরু করে দিলো তখন দিপালী বের করে নিলো টেবিলের ড্রয়ার থেকে পিস্তলখানা।

পিস্তলখানা নিয়ে দেখে নিলো তাতে গুলী ভরা আছে কিনা। যা সে ভেবেছিলো তাই পেয়েছে, পিস্তলে গুলীভরা রয়েছে। এবার দিপালীর মুখখানা হাসিতে ভরে উঠলো, সে পিস্তল উদ্যত করে মোরিং-এর পিঠ লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র আর্তনাদ শোনা গেলো সেখানে, ঢলে পড়লো মোরিং-এর সহচরটা। দিপালী মোরিংকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লেও গুলী গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিলো মোরিং-এর সহচরটির পাঁজরে।

মেঝেতে চীৎ হয়ে পড়ে গেলো মোরিং-এর সহচর।

দিপালী যা ভেবেছিলো তা হলো না, সে মনে করেছিলো মোরিংকে শেষ করতে পারলে তার সহচরকে কাবু করতে বেশি বেগ পেতে হবে না। কিন্তু হলো বিপরীত, মোরিং-এর দেহে গুলী বিদ্ধ না হয়ে হলো তার সহচরের দেহে।

লোকটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়তেই দিপালীর মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। ভয়বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সে মোরিং এর দিকে।

মোরিং এবার খুব খুশি হয়ে উঠেছে; সে দিপালীকে ধন্যবাদ জানিয়ে অগ্রসর হলো তার দিকে। দু'চোখে তার লালসাপূর্ণ ভাব ফুটে উঠেছে, সেকি ভীষণ আর ভয়ঙ্কর চেহারা! দিপালী শিউরে উঠলো, এর কবল থেকে রক্ষার বুঝি আর কোনো উপায় নেই।

তখনও কিন্তু দিপালীর হাতে পিস্তল রয়েছে।

দিপালী ভীতা হরিণীর মত কাঁপছিলো, ভয়ে নয় আতঙ্কে। এবার মোরিং-এর কবল থেকে মুক্তির আশা দুরাশা।

মোরিং এগুচ্ছে।

চোখ দুটো তার ক্ষুব্ধ শার্দুলের মত জ্বলছে।

কক্ষের লালচে আলোতে ভয়ঙ্কর একটা জন্তুর মত লাগছে মোরিংকে।

দিপালী তাকালো মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা রক্তাক্ত দেহটার দিকে। একটু পূর্বেও লোকটা তাকে পাবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো। দিপালী তাকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ লোকটার দিকে দেখার সময় নেই। মোরিং নরপশুটা তার দিকে এগুচ্ছে। ওর হাত থেকে বাঁচতে হবে। এখন ভয় পেলে বা ভেঙে পড়লে চলবে না। কঠিন হয় সে।

ক্রুদ্ধ সিংহীর মত গর্জে উঠলো দিপালী, হাতে তার উদ্যত পিস্তল, কঠিন কণ্ঠে বললো—খবরদার, এক পাও এগুবে না......

মোরিং দিপালীর আচরণে বিস্মিত হলো। এতক্ষণ দিপালীকে অন্যরূপে দেখেছিলো সে, এখন সেই দিপালী তার দিকে পিস্তল উদ্যত করে ধরবে, সে ভাবতেও পারেনি। মোরিং সঙ্গীটির প্রাণহীন দেহটার দিকে তাকালো।

রক্তে ভেসে গেছে মেঝেটা।

তাকালো মোরিং দিপালীর দিকে।

ওকে তখন ভয়ঙ্করী বলে মনে হচ্ছিলো, বিশেষ করে তার হাতের পিস্তলখানা মৃত্যুর জন্য তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

পরবর্তী বই
মুখোশের অন্তরালে

মুখোশের অন্তরালে–৯৬

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক
দস্যু বনহুর

❑ মোরিং পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে দমে গেলো। কণ্ঠস্বর নরম করে বললো—সুন্দরী, তোমাকে আমি জোর করে পেতে চাই না। তুমি যা বলবে তাই করবো।

দিপালী কঠিন কণ্ঠে বললো—যদি জীবনে বাঁচতে চাও তাহলে যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেখানেই চুপ করে দাঁড়াও।

মোরিং এগুতে সাহসী হলো না, তাকালো সে নিজের পায়ের সামনে পড়ে থাকা রক্তাক্ত মৃতদেহটার দিকে। লোকটার মুখ হা হয়ে আছে, মুখের দু'পাশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মৃত লোকটার বিকৃত চেহারার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবলো মোরিং, তারপর সে এগুলো কয়েক পা সামনের দিকে।

দিপালী বুঝতে পারলো মোরিং-এর উদ্দেশ্য। সে কোনোক্রমে তার পাশে আসতে পারলেই তাকে আক্রমণ করবে। কিন্তু সে সুযোগ দেবে না দিপালী, মোরিংকে লক্ষ্য করে গম্ভীর কণ্ঠে বললো—খবরদার, এক পাও এগুবে না। একটু নড়লেই গুলী ছুড়বো।

মোরিং বলে উঠলো—বেশ, আমি এক পাও এগুবো না কিন্তু তুমি যা ভাবছো তাও হবে না। আমাকে হত্যা করলে তুমিও মুক্তি লাভ করতে পারছো না। কারণ এ ভূগর্ভের পথ তুমি চেনো না, কাজেই আমি যদি তোমাকে পথ দেখিয়ে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যাই তাহলেই তুমি মুক্তি পাবে, না হলে না......

দিপালী পিস্তল হাতে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেও তার দৃষ্টি ছিলো মোরিং-এর উপর, সে যেন এগুতে না পারে। পিস্তলে অবশ্য গুলী রয়েছে, এই মুহূর্তে সে হত্যা করতে পারে মোরিংকে কিন্তু তা সে করবে না। করলে সে এই অন্ধকার কক্ষের পথ খুঁজে পাবে না, এটা সত্য। দিপালী কতকটা অসহায় মনে করলো নিজকে কিন্তু চেহারায় সেই ভাব প্রকাশ পেতে দিলো না মুখমন্ডল কঠিন করে রাখলো যাতে মোরিং তার মনের ভাব বুঝতে না পারে।

দিপালী জানে কোন্ পথে রাজকুমার ও ক্যারিলং মেঝে সহ নেমে গেছে নিচে। চাবিকাঠি তার জানা আছে, কাজেই মেঝের ঐ স্থানে লক্ষ্য রেখে সে একটু একটু করে সরে আসছিলো।

হঠাৎ মোরিং দিপালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কেড়ে নিতে গেলো দিপালীর হাতের পিস্তল কিন্তু সে সুযোগ পেলো না মোরিং।

সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের ট্রিগার টিপলো দিপালী। তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো মোরিং, তারপর টলতে লাগলো মাতালের মত।

ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে মোরিং-এর চিবুক বেয়ে।

দু'হাত বাড়িয়ে মোরিং দিপালীকে ধরতে গেলো কিন্তু তার পূর্বেই থুবড়ে পড়ে গেলো সে মেঝেতে। যাক, শয়তানটা শেষ হয়ে গেলো। মনে মনে খুশি হলো দিপালী।

দিপালী পিস্তলটাকে তার পরম বন্ধু বলে মনে করলো। চুমু খেলো দিপালী পিস্তলটার গায়ে, তারপর পিস্তলটা কোমরের ফাঁকে কাপড়ের আড়ালে গুঁজে রেখে মেঝের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালো।

আশ্চর্য, এখন ঐ স্থানে কোনোরকম চিহ্ন নেই যে, ওখানে লিফ্‌ট ধরনের কিছু আছে। অথচ দিপালী নিজের চোখে দেখেছে ঐ পথে ক্যারিলংকোর এক অনুচর নেমে গেছে নিচে।

দিপালী মেঝের পাশে ছোট বোতামটার উপর পা দিয়ে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটার কিছু অংশ সরে গেলো একপাশে, নিচে থেকে উপরে উঠে এলো সেই খাঁচা সহ লিফটখানা।

দিপালী সেই খাঁচার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করলো। ছোট্ট একটা সুইচ খাঁচার গায়ে লাগানো আছে।

দিপালী সুইচটায় হাত রেখে টিপলো।

বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো দিপালী লিফট ধরনের খাঁচাটার দরজা খুলে গেলো।

দিপালী আবার তাকিয়ে দেখলো মেঝেতে পড়ে থাকা রক্তাক্ত মৃতদেহ দুটোর দিকে, তারপর উঠে পড়লো লিফটের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে লিফটখানা নিচে নেমে চললো।

কয়েক সেকেন্ড মাত্র।

লিফটখানা এসে থেমে পড়লো নিচে।

সামনে চাইতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলো দিপালী, বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলো সে।

লিফটের খাঁচার নিচে তার সামনা সামনি দাঁড়িয়ে আছে ক্যারিলং ঠিক যমদূতের মত।

যার ভয় তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছিলো, সেই ক্যারিলংএর সম্মুখে এসে দিপালী উপস্থিত হয়েছে। আগে সে যদি জানতো তাহলে কিছুতেই ঐ লিফটে উঠতো না।

কিন্তু এখন উপায়?

দিপালী নিরুপায়ভাবে তাকালো সম্মুখে দন্ডায়মান যমদূতের মত ভয়াল ক্যারিলং-এর দিকে।

ক্যারিলং সবেমাত্র বনহুরের সন্ধান থেকে বিরত হয়েছে। সে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলো, সহসা শিকার সম্মুখে উপস্থিত দেখে শার্দুলের মত হিংস্র হয়ে উঠলো। একটা ভয়ঙ্কর ভাব ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে।

দিপালী শিউরে উঠলো মনে মনে।

ক্যারিলং হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো, তারপর বললো—হঠাৎ না চাইতেই অমৃত সুধা......সুন্দরী, এবার তুমি নিজেই এসে ধরা দিলে। এসো, এসো সুন্দরী......

না, আমি তোমাকে ধরা দিতে আসিনি শয়তান, আমি এসেছি তোমাকে হত্যা করতে। কথা শেষ করেই দিপালী কোমরের আড়াল থেকে পিস্তল বের করে উদ্যত করে ধরলো কিন্তু গুলী ছুঁড়বার পূর্বক্ষণেই ক্যারিলং একটা বোতাম টিপলো।

মুহূর্তমাত্র...খাঁচাসহ দিপালী সাঁ করে নেমে গেলো নিচে, চারিদিকে অন্ধকার, কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ খাঁচার তলদেশ খসে পড়লো, দিপালী ঝুপ্ করে এসে পড়লো যেন কিছুর উপর। কিন্তু একি, এ যে দুটি বাহু, দুটি বাহুর মধ্যে দিপালী আটকা পড়ে গেছে।

দিপালী আবছা অন্ধকারে ভালভাবে লক্ষ্য করতেই চাপা কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এলো—দিপালী; ভয় নেই—আমি।

রাজকুমার আপনি!

হাঁ, আমি সব জানতে পেরেছিলাম, তাইতো অপেক্ষা করছিলাম......কথাটা বলতে বলতে দিপালীকে দাঁড় করিয়ে দিলো বনহুর মেঝেতে।

দিপালীর মনে এক অপূর্ব অনুভূতি নাড়া দিয়ে গেলো। সে যা কল্পনা করতে পারেনি তাই সে পেয়েছে। এই বিপদ মুহূর্তে পেয়েছে তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত রাজকুমারকে।

আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে দিপালী আত্নহারা, সে ভুলে গেলো সব কথা, লুটিয়ে পড়লো বনহুরের বুকের উপর।

দিপালী ভাবের আবেশে আত্নহারা, এত নিবিড় করে সে কোনোদিন তার রাজকুমারকে পায় নি। সমস্ত বিপদের কথা ভুলে গেলো সে ঐ মুহূর্তে।

রাজকুমারের বুকে মুখ গুঁজে বলে দিপালী—আমি ভাবতে পারিনি এমন অবস্থায় আপনাকে পাবো।

কিন্তু এ স্থান আমাদের জন্য নিরাপদ নয় দিপালী। এবার ক্যারিলং আমাদের পেলে নিশ্চয়ই হত্যা করবে। কথাটা শেষ করেই বনহুর দিপালীর হাত মুঠায় চেপে ধরে বললো—এসো দিপালী, এখানে আর নয়।

কোথায় যাবো আমরা?

পথের সন্ধান আমি পেয়েছি, ঐ পথে বেরিয়ে যাবো এই ভূগর্ভ মৃত্যুগহ্বর থেকে।

রাজকুমার।

হাঁ দিপালী।

বনহুর আর দিপালী একটা অন্ধকার গহ্বর দিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত এগুতে লাগলো।

কিছুটা চলার পর একটু আলোকরশ্মি নজরে পড়লো তাদের।

অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছে দিপালী।

বনহুরের হাতের মুঠায় তখনও তার হাতখানা ধরা আছে। বললো বনহুর—এবার একটু এগুলেই আমরা রেলপথ পাবো।

রেলপথ! আশ্চর্য কণ্ঠে বললো দিপালী।

বনহুর বললো—হাঁ, কোনো এক কয়লাখনির সঙ্গে যোগ আছে এই রেললাইনের, বুঝলে?

দিপালী এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না।

রেলপথ? কিসের রেলপথ? এখানে এই ভূগর্ভে রেলপথ এলো কি করে? এলোমেলো অনেক চিন্তাই দিপালীর মাথার মধ্যে কিলবিল করতে লাগলো। অবশ্য বনহুর যখন বললো তখন তার মনে সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবু কেমন লাগছে, রাজকুমার ভুল করছে না তো? এই গভীর মাটিরতলায় রেলপথ—এ যে বিস্ময়কর।

বনহুর আর দিপালী সুড়ঙ্গ দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলো আরও কিছু পথ, এবার আলোর ছটা বেশ স্পষ্ট দেখা গেলো। দিপালী অবাক হয়ে দেখলো পায়ের নিচে মজবুত লৌহ স্তর পাতা রয়েছে। ভালভাবে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো এটা কোনো রেলপথ।

সন্দেহ তার দূর হলো। আরও কিছুটা এগিয়ে এসে দেখতে পেলো রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে দুটি বগি।

বনহুর বললো—দিপালী, একটু পরই ইঞ্জিন এসে এই বগি দুটিকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যাবে, আমরা তার পূর্বেই এই বগিটার মধ্যে আত্মগোপন করবো। এসো, আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত হবে না।

বনহুর দিপালীর হাত মুঠায় চেপে ধরে থেমে থাকা গাড়ির বগি দুটির দিকে এগিয়ে গেলো। খুব দ্রুত উঠে পড়লো বনহুর বগির উপরে, তারপর দিপালীকে তুলে নিলো।

বগি দুটিতে স্পঞ্জ জাতীয় পদার্থ বোঝাই করা ছিলো। বনহুর আর দিপালী স্পঞ্জের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো।

ঠিক সেই মুহূর্তে দু'জন লোক একটি ইঞ্জিন চালিয়ে নিয়ে উপস্থিত হলো সেখানে। লোক দুটির মুখ মুখোশে ঢাকা, কাজেই তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না।

ইঞ্জিন এসে যোগ হলো গাড়ি দুটির সঙ্গে।

বনহুর চাপাকণ্ঠে বললো—দিপালী, খুব সাবধানে চুপচাপ বসে থাকো।

দিপালী বললো—আচ্ছা।

বনহুর বললো—পিস্তলটা আমার হাতে দাও।

দিপালী কোমরে হাত দিয়ে দেখলো পিস্তলটা নেই, কখন কোথায় পড়ে গেছে সে নিজেও বুঝতে পারেনি।

বললো দিপালী—রাজকুমার, পিস্তলটা আমার কাছেই ছিলো, কোথায় পড়ে গেছে বুঝতে পারিনি।

যাক, যা গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ হবে না।

দিপালী বললো—এখন তাহলে আমরা বড় অসহায়।

না দিপালী, আমরা অসহায় নই, খোদা আমাদের সহায়।

দিপালীর মাথাটা নত হয়ে এলো, কারণ ঈশ্বরের প্রতি তারও সীমাহীন বিশ্বাস আছে, তাই সে বনহুরের কথায় খুশি হলো মনে মনে।

বগি দুটোসহ ইঞ্জিন চলতে শুরু করেছে।

বনহুর আর দিপালী স্পঞ্জের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও মন তাদের অস্থির ছিলো, কারণ ইঞ্জিন সহ বগি দুটি ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেলে একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেখানে তারা ধরা পড়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই সেই সময়টার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলো বনহুর আর দিপালী।

সেকি ভীষণ দুর্গম সুড়ঙ্গপথ, বগি দুটো সহ ইঞ্জিনখানা ঝক ঝক শব্দে এগিয়ে চলেছে। ক্রমেই গাড়িখানা নিচের দিকে নামছে।

দুলছে গাড়িখানা।

স্পঞ্জের মধ্যে কোনো কষ্ট হচ্ছিলো না বনহুর বা দিপালীর। তারা উভয়ে চুপটি মেরে বসে রইলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলো ইঞ্জিনসহ বগি দুটো। বনহুর বললো—দিপালী, এই মুহূর্তে আমাদের সরে পড়তে হবে। বনহুর দিপালীর হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে প্রস্তুত হয়ে নিলো।

ইঞ্জিনখানা ততক্ষণে খুলে গেছে বগি দুটো থেকে।

বেশ দূরে সরে গেলো ইঞ্জিনখানা।

বনহুর বললো—নেমে পড়ো দিপালী।

বনহুর আর দিপালী স্পঞ্জের মধ্য থেকে বেরিয়ে বগির পিছন অংশ দিয়ে নেমে পড়লো নিচে।

ঐ মুহূর্তে কয়েকজন লোক ছোট ছোট বাক্স পিঠে বহন করে পাশে থেমে থাকা দুটি বগিতে উঠছে দেখতে পেলো বনহুর আর দিপালী।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো তাদের ঠিক পিছনেই কয়লার স্তূপ।

দিপালীর হাত ধরে বনহুর দ্রুত একটা কয়লার স্তূপের আড়ালে আত্মগোপন করলো।

বললো দিপালী—এ যে কয়লার খনি দেখছি!

হাঁ দিপালী, আমি তোমাকে আগেই বলেছি আমরা একটা কয়লার খনির অভ্যন্তরে এগিয়ে যাচ্ছি।

আশ্চর্য।

হাঁ, আশ্চর্যই বটে। ক্যারিলং এই কয়লার খনিটার ভিতর দিয়েই নিজেদের কারবার মানে চোরাচালানী ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু লোক দেখানোর জন্য কয়লার খনিটা। ঐ যে দেখছো—উপর থেকে নিচে নেমে আসছে প্যাকেটগুলো, ওরই মধ্যে লুকানো আছো কোনো মূল্যবান সম্পদ যা আমাদের দেশ থেকে ......থামলো বনহুর।

দিপালী তাকিয়ে দেখছিলো, ক্রেন দিয়ে উপরে তুলে নেওয়া হচ্ছে চাপ চাপ কয়লা আর নিচে নামানো হচ্ছে স্পঞ্জ বোঝাই প্যাকেট। বললো দিপালী—থামলেন কেন, বলুন?

বললো বনহুর—আমাদের দেশের মূল্যবান সম্পদ ওর স্পঞ্জের প্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে কয়লার খনিতে নামিয়ে দিচ্ছে এবং উপরে তুলে দেওয়া হচ্ছে কয়লা.....ঐ দেখো, যে স্পঞ্জের প্যাকেটগুলো খালি বগিতে উঠিয়ে নিচ্ছে, ওগুলোর মধ্যেই আছে মূল্যবান দ্রব্য যা ক্যারিলং গোপনে বিদেশে পাচার করে থাকে।

দিপালীর দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। বললো সে—রাজকুমার, ক্যারিলং আমাদের দেশেরই শুধু সর্বনাশ করছে না—সে সারা বিশ্বের ক্ষতি সাধন করছে নানাভাবে। তুমি তার প্রমাণ পেয়েছো বা পাচ্ছো নিজের চোখে।

হাঁ, তার জ্বলন্ত প্রমাণ মিস্ লুনার হত্যাকাণ্ড। দিপালীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

ওদিকে কয়েকজন লোক বগি থেকে স্পঞ্জের প্যাকেটগুলো নামাতে শুরু করে দিয়েছে।

অবাক হয়ে দেখছে দিপালী।

বনহুর চাপাকণ্ঠে বললো—যে কয়লার চাপগুলো উপরে উঠে যাচ্ছে তার মধ্যে লুকিয়ে আমরা উপরে উঠে যাবো।

কিভাবে তা সম্ভব? বললো দিপালী।

বনহুর বললো—সম্ভব নয়, তবু উপায় করে নিতে হবে দিপালী। ঐ যে কয়লার চাপ সহ ক্রেন উপরে উঠে যাচ্ছে, তারই সঙ্গে যেতে হবে। যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। জানি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে...

রাজকুমার, আমার জন্য আপনি ভাববেন না। আমি ভাবছি আর একজনের কথা—রহমান ভাই...তাকেও আমরা হারালাম।

না, সে জীবিত আছে।

রহমান ভাই জীবিত আছে?

হাঁ দিপালী, আমি তাকে দেখেছি কিন্তু আপাততঃ তাকে উদ্ধার করার কোনো উপায় খুঁজে পাইনি।

তাহলে রহমান ভাইকে এই মৃত্যুগহ্বরে রেখে...

হাঁ, তাই যেতে হবে দিপালী, কারণ নিজেরা বাঁচতে হবে, তারপর বাঁচাতে হবে রহমানকে। সে বড় কষ্টে আছে।

কোথায় আছে সে?

এই ভূগর্ভের অন্ধকার গুহার একটি ভয়ঙ্কর স্থানে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে। তাকে হাত-পা শিকলে বেঁধে দাঁড় করে রাখা হয়েছে এবং মাঝে মাঝে কশাঘাত করা হচ্ছে। দিপালী তোমাকে উপরে পৌছে দিয়ে আমি আবার ফিরে আসবো।

আর্তকণ্ঠে বলে উঠে দিপালী—কোথায়? কোথায় ফিরে আসবেন আপনি?

এখানে।

এখানে আর আপনাকে আসতে দেবো না রাজকুমার।

তাহলে রহমানের অবস্থা কি হবে? তবে এখনও আমাদেরও অনেক কিছু ঘটতে পারে, আমাদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে!

বনহুর আর দিপালী প্রতীক্ষা করতে লাগলো কখন সুযোগ আসবে যখন তারা সরে পড়তে সক্ষম হবে আড়াল থেকে। সুযোগ পেয়েও গেলো কিছুক্ষণের মধ্যে অযাচিতভাবে। যারা স্পঞ্জের প্যাকেটগুলো খালি বগির মধ্যে ভরছিলো তারা কাজ শেষ করে সরে গেলো।

যারা ক্রেন দিয়ে খনির উপরিভাগে কয়লার চাপ তুলে দিচ্ছিলো এবং স্পঞ্জের প্যাকেট নামিয়ে নিচ্ছিলো, তারাও সরে গেলো, যেন কোনো সংকেতধ্বনি তারা শুনতে পেয়েছে।

হয়তো ভাগ্য তাদের প্রসন্ন তাই এমন সুযোগ এলো।

বনহুর আর দিপালী মুহূর্ত বিলম্ব না করে বেরিয়ে এলো কয়লার চাপের ভিতর থেকে। দ্রুত কয়লার স্তূপের আড়ালে লুকিয়েক্রেনটার পাশে গিয়ে হাজির হলো! দিপালীকে ক্রেনের মধ্যে বসিয়ে সুইচ টিপে বনহুর নিজেও দ্রুত এসে বসলো দিপালীর পাশে। ক্রেন সা সা করে উপরে উঠে যেতে লাগলো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড, দিপালী আর বনহুর এসে পৌঁছে গেলো খনির উপরিভাগে।

বনহুর আর দিপালী ক্রেন উপরে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লো এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওপাশে থেমে থাকা একটা বগির মধ্যে উঠে পড়লো। বগি বোঝাই ছিলো চাপ চাপ কয়লা।

কয়লার চাপের আড়ালে লুকিয়ে রইলো ওরা দু'জন।

আশেপাশে ভাগ্যিস কেউ ছিলো না তাই রক্ষা। বনহুর অবশ্য প্রস্তুত হয়েই ছিলো যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে মোকাবিলা করবে। কিন্তু তেমন কোনো দুর্যোগ এলো না, নিশ্চিন্ত মনেই বসলো ওরা দু'জন কয়লার চাপগুলোর আড়ালে।

❑

কয়লা বোঝাই বগিগুলোকে একটা ছোট্ট ইঞ্জিন টেনে নিয়ে চললো। নির্জন পথ, দু'পাশে ঘন জঙ্গল। ইঞ্জিনে মাত্র দু'জন চালক। তাদের দেহে অদ্ভুত পোশাক, মুখে অদ্ভুত ধরনের মুখোশ।

পথের ধারে লোকজন নেই, এমন কি জীবজন্তুও নজরে পড়ছে না, শুধু গাছপালা আর পাথরের স্তূপ স্থানে স্থানে জড়ো হয়ে আছে।

পাথুরিয়া মাটি কেটে সরু রেললাইন বসানো হয়েছে। কতদিন আগে এবং কখন ঐ রেলপথ বসেছে তা বলা মুস্কিল, তবে এটা যে এদের গোপন পথ তাতে কোনো ভুল নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে এ রেললাইন। এর শেষ কোথায় তাও জানে না বনহুর বা দিপালী।

দিপালী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, তারপর ক্ষুধার তাড়না। তাই সে কখন কয়লার চাপে দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, নিজেই টের পায়নি।

ঝিরঝিরে বাতাস আর বগিগুলোর চলাকালে মৃদু মৃদু ঝাঁকুনিতে বনহুরের চোখেও নিদ্রা জড়িয়ে আসছিলো। কখন যেন সেও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো নিজেই বুঝতে পারেনি।

হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িখানা থেমে পড়লো। তন্দ্রা ছুটে গেলো বনহুরের।

সে উঁকি দিয়ে দেখলো কয়লার আড়াল থেকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এসে গাড়িখানা থেমে পড়ছে। ইঞ্জিন থেকে চালকদ্বয়ের একজন নেমে পড়লো।

বনহুর আরও ভালভাবে তাকালো। সবিস্ময়ে দেখতে পেলো চারজন লোক ইঞ্জিন চালকদ্বয়ের যে একজন নেমে দাঁড়িয়েছে তার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলছে। লোক চারজনের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা না গেলেও বেশ বোঝা গেলো তারা গোপন কোনো আলোচনা করছে। প্রত্যেকের পিঠে একটা করে ব্যাগ বাঁধা রয়েছে।

বনহুর দিপালীকে জাগাবে কিনা ভাবছে, ঠিক এমন সময় বগি সহ ইঞ্জিনখানা চলতে শুরু করলো।

ইঞ্জিন থেকে যে ব্যক্তি নেমে পড়েছিলো সে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইঞ্জিনটায় উঠে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য চার ব্যক্তিও লাফিয়ে উঠে পড়লো পিছন বগিগুলোর মধ্যে।

দু'জন সম্মুখের বগিতে অপর দু'জন বনহুর আর দিপালী যে বগির মধ্যে আত্মগোপন করে আছে সেই বগিতে উঠে পড়লো। গাড়িখানা পূর্বের গতিতে চলতে শুরু করলো।

বনহুর আর দিপালী পাশাপাশি রয়েছে।

দিনের আলোতে বনহুর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে দিপালীর মুখখানা। গাঢ় নিদ্রায় অচেতন দিপালী, গাড়ির ঝাঁকুনিতে তার দেহখানা দুলছিলো।

বনহুর লক্ষ্য করছিলো লোক দুটোকে।

দু'জনের কাঁধেই ব্যাগ রয়েছে।

ব্যাগে কি আছে জানে না বনহুর, তবে নিশ্চয়ই কোনো মূল্যবান কিছু তাতে আছে বলেই মনে হচ্ছে।

লোক দু'জন ইচ্ছা করলে একই গাড়িতে উঠে পড়তে পারতো কিন্তু তা করেনি তারা, তবে কি কোনো গোপন কারণ আছে? কিছু বলাবলি করছে ওরা দু'জন।

বনহুর কান পাতলো।

ওরা বেশ স্পষ্ট করেই কথা বলছে।

একজন বললো—দেশের সব সম্পদ এদের হাতে তুলে দিচ্ছি। সত্যি বড় অপদার্থ আমরা।

হাঁ, ঠিক বলেছো রামানন্দ, আমরা অপদার্থ বটে। দেশের সম্পদ বাইরে পাচার করে দিচ্ছি, তার বিনিময়ে পাচ্ছি গুটিকয়েক টাকা।

মান সম্মান সব বিক্রি করে তবেই তো টাকা পাচ্ছি। আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না এ সব করতে। বললো রামানন্দ। অপর ব্যক্তির নাম কি জানে না বনহুর, হয়তো বা রামানন্দের বিপরীতে শ্যামানন্দ হবে কিংবা হবে রাম সিং নতুবা হীরালাল। কিন্তু একটু পরই আর একজনের নাম জানতে পারলো বনহুর যখন রামানন্দ বললো—রহমত মিয়া, তুমি যা ভেবেছো তাই করা ভাল। দেশের সম্পদ বাইরে পাচার করে আমাদের লাভ কি? আমরা এ সব কাজ ছেড়ে দেবো এবং সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করবো। এতে মনের সান্ত্বনা থাকবে, আমরা কোনো অসৎ কাজ করছি না।

ঠিক বলেছো ভাই, এসব কাজ আমিও ছেড়ে দেবো আজ থেকে। আমাদের সঙ্গে যে সোনা ও পাথর আছে, এগুলো আমরা জমা দেবো না।

তাহলে কি করবে?

নিয়ে সরে পড়বো।

জানো তার পরিণতি কি হবে?

জানি আমাকে পেলে ওরা হত্যা করবে।

শুধু হত্যাই করবে না, তোমার দেহের চামড়া খুলে মানে জীবন্ত অবস্থায় দেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে লবণ মাখিয়ে তারপর মাটিতে পুঁতে ফেলবে।

এ সবে আমার ভয় নেই, কারণ যে পাপ আমরা করছি তার উপযুক্ত শাস্তি আমাদের হওয়া দরকার।

তাহলে কি করতে চাও?

পালাতে চাই।

যা সোনা ও পাথর রয়েছে তা নিয়েই পালাবো আমরা, তারপর ক্যারিলং-এর আসল পরিচয় ও আস্তানা পুলিশকে জানিয়ে দেবো।

বনহুরের মুখে এক ঝলক আনন্দের দ্যুতি খেলে গেলো, লোক দুটি যা বলছে সত্য, ওদের হাত করতে পারলে অনেক কিছু জানা যাবে।

বনহুর যখন ওদের নিয়ে ভাবছে তখন লোক দু'জন উঠে পড়লো, তারা বগির দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো।

একজন বললো—তবে আর দেরী নয়, আজই সরে পড়তে হবে।

আজ নয়, এক্ষুণি।

সংগে সংগে চলন্ত ট্রেন থেকে ওরা দু'জন কৌশলে লাফিয়ে পড়লো।

বনহুর মনে মনে বললো—সাবাস!

ওরা লাফ দিয়ে পালানোর পর বনহুর জাগিয়ে দিলো দিপালীকে, কারণ ওকে না জাগালে এ মুহূর্তে চলছে না। ওর দেহে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকলো বনহুর—দিপালী এবার ওঠো।

দিপালী সাড়া পেতেই জেগে পড়লো। চোখ রগড়ে বললো—রাজকুমার, বড় ভুল হয়েছে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বললো বনহুর—অবশ্য তোমাকে ঘুমানোর সুযোগ আমিই দিয়েছিলাম। শোনো দিপালী, আর ঘুমানো চলবে না। এবার আমরা এমন কোনো গোপন আড্ডাখানার সন্ধান পাবো যেখানে মানুষের কোনো চিহ্ন নেই, মানে বাইরের জগতের কোনো মানুষ সেখানে নেই, আছে শুধু ঐ নরপশুদের দলের লোক।

আমরা অনেকদূরে এসে পড়েছি, তাই না রাজকুমার?

হাঁ দিপালী, আমরা সেই কয়লার খনি থেকে অনেক দূর এসে পড়েছি। গাড়িখানা এখনও চলছে, বোধ হয় আরও যাবে।

আর কতদূর যাবে? বললো দিপালী।

বনহুর বললো—ঠিক জানি না এ পথ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

দু'পাশে ঘন জঙ্গল!

ইচ্ছা করলে বনহুর আর দিপালীও উধাও হতে পারে। কিন্তু তারা তা করলো না। বিশেষ করে বনহুর জানতে চায় এর শেষ কোথায় এবং কি? এই কয়লা বোঝাই বগিগুলোর তলায় কি আছে তাও জানতে চায় বনহুর। এবং যে ব্যক্তিগুলো কাঁধে অদ্ভুত ব্যাগ বহন করে বগিগুলোতে উঠে বসলো তাদের কাঁধের ব্যাগগুলোতেই বা কি আছে। অবশ্য বনহুর সে ব্যাপারে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে, কারণ তাদের বগিতে যারা দু'জন উঠে পড়েছিলো তাদের কথাবার্তায় অনেকটা আন্দাজ করে নিতে পেরেছে সে।

কয়লার তলায় কি আছে তাই জানা দরকার।

এ সন্দেহ কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর হলো।

থেমে পড়লো ইঞ্জিনখানা।

বগিগুলোও ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে পড়লো।

দিপালী বললো—রাজকুমার এখন উপায়? ওরা নিশ্চয়ই আমাদের দেখে ফেলবে।

বনহুর পূর্বের ন্যায় শান্তকণ্ঠে বললো—এখন ওরা দেখে ফেললেই ভাল হয়; কারণ আমি ওদের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই।

কিন্তু......

কোনো কিন্তু নেই, তোমার জন্য রয়েছি আমি। দিপালী, এতটা যখন অগ্রসর হয়েছি তখন আর সরে যাবো না, এর শেষ কোথায় দেখতে চাই......তবু হাতেনাতে ধরা পড়তেই চাই না, যতক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে চলতে পারি......এসো দিপালী এসো......দিপালীর হাত ধরে বনহুর উঠে পড়লো এবং পিছন দিক দিয়ে নেমে পড়লো গহন জঙ্গলের ঝোপটার মধ্যে।

দিপালী!

বলুন রাজকুমার?

তুমি কত কষ্ট পাচ্ছো।

এ কষ্ট কিছু না রাজকুমার। একটু থেমে বললো দিপালী—আমি একটা কথা ভাবছি যদি আপনার মনমত হয় তাহলে......

বলো?

আমাকে যেতে দিন ওদের সঙ্গে আমি কৌশলে সবকিছু জেনে নিয়ে আপনাকে জানাবো।

খুশি হয়ে বললো বনহুর—পারবে! আমি জানি তুমি পারবে।

আশীর্বাদ করুন যেন কৃতকার্য হতে পারি।

বনহুর হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো—তোমার জন্য সব সময় আমার আশীর্বাদ রয়েছে।

গহন জঙ্গলের একটা ঝোপের আড়ালে কথাবার্তা হচ্ছিলো বনহুর আর দিপালীর।

ততক্ষণে ইঞ্জিন থেকে চালক দু'জন নেমে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নেমে দাঁড়িয়েছে সেই দু'জন লোক যাদের পিঠে বাঁধা ছিলো অদ্ভুত ধরনের ব্যাগ। কিন্তু আর দু'জন গেলো কোথায়? সবাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে।

তখন দিপালী নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো। বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—এবার আমি যেতে চাই রাজকুমার?

যাও, আমি তোমার প্রতীক্ষা করবো।

দিপালী ঝোপটার মধ্য হতে বেরিয়ে এলো এবং এলোমেলো বেশে কাঁদতে শুরু করে দিলো।

হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনে হতভম্ব হলো ইঞ্জিনচালক দু'জন, আর অপর দু'জন লোক যারা এতক্ষণ সঙ্গীদের সন্ধান করছিলো তারাও চমকে তাকালো।

দিপালী কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে এলো, বললো—আমাকে বাঁচান আপনারা। আমাকে বাঁচান......

ইঞ্জিন চালকদ্বয় এবং লোক দু'জন এমনিতেই হয়রান-পেরেশান হয়ে পড়েছিলো, কারণ তাদের সঙ্গী দু'জন কোথায় হারিয়ে গেছে বুঝতে পারছে না।

দিপালী এলোমেলো বেশে যখন গাড়িখানার পাশে এসে দাঁড়ালো তখন ওরা ঘিরে ধরলো তাকে। ওদের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে, ওরা অবাক হয়ে তাকাচ্ছে এ ওর মুখের দিকে।

ইঞ্জিনচালকদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলো—কে তুমি?

বললো দিপালী—বাবুজী, বড় বিপদে পড়েছি, একটু আশ্রয় দিন।

অপরজন বললো—এই গহন জঙ্গলে তুমি এলে কি করে? এখানে তো কেউ আসতে পারে না।

বাবুজী, একটু আশ্রয় দিন। বিপদ কেটে গেলে সব বলবো, ওরা আমাকে ধরে এনেছে......

ওরা! ওরা কারা?

দিপালী আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো গহন জঙ্গলের ভিতরের একটা দিকে।

ওরা তাকালো সেইদিকে যেদিকে দিপালী দেখিয়ে দিলো আংগুল দিয়ে।

দিপালী তো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে—আমাকে একটু আশ্রয় দিন। আজকের মত আশ্রয় দিন।

ততক্ষণে আরও কয়েকজন লোক এসে পড়লো।

বললো তাদের মধ্যে হতে একজন—কি, ব্যাপার কি?

অপরজন বললো—ব্যাপার দেখো এসে। না চাইতেই গঙ্গাজল।

তার মানে?......কথাটা বলে এগিয়ে আসতেই নজর পড়লো দিপালীর উপর।

ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর দিপালী, তা ছাড়া কতদিন গোসল নেই। এলোমেলো চুল, চোখ বসে গেছে তবু দিপালীর রূপ-যৌবন ঢল-ঢল করছিলো। একরাশ চুল ছড়িয়ে আছে পিঠেকাঁধে। পটলচেরা আঁখি দুটি অশ্রু ছলছল করছে। দেহের বর্ণ এখনো এতটুকু মলিন হয়নি, যেন দুধে আলতা মেশানো।

দিপালীকে দেখে ওদের জিভে পানি এসে গেলো। ওর যৌবন ঢলঢল দেহখানা আকৃষ্ট করলো সবাইকে। নরপশুর দল দিপালীকে পেয়ে আত্মহারা, ঠিক সেই দণ্ডে একটা অদ্ভুত শব্দ হলো।

আশ্চর্য, সংগে সংগে সবাই কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলো এবং নিজ নিজ কাজে মনোযোগ দিলো।

দিপালী বুঝতে পারলো এমন কেউ আসছে যার আগমনে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে!

বগি থেকে কয়লা নামানো শুরু হলো দ্রুতগতিতে। দিপালী ভালভাবে তাকিয়ে দেখলো চারপাশে কয়লার স্তূপ। এত কয়লা এখানে জমা করা হচ্ছে কেন, কি এর কারণ?

কিন্তু কে দেবে তার জবাব!

দিপালী আঁচলে চোখ মুছে চলে যাচ্ছিলো।

একজন ডেকে বললো—এই, যেও না, আমাদের মালিক আসছে। এলে তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবো আমরা। তুমি আশ্রয় পাবে।

দিপালী দাঁড়িয়ে রইলো, সে যা চেয়েছিলো তাই হলো। সে দেখতে চায় কি ঘটে এরপর, তবে শব্দটা শোনার পর আরও কৌতুহল বেড়েছে দিপালীর, আড়ালে দাঁড়িয়ে তা দেখছে বনহুর।

কয়লা নামানো হলো। যে দু'জন কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা তখনও অপেক্ষা করছে!

ইঞ্জিন চালকদ্বয়ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করছিলো।

এমন সময় একটা অদ্ভুত যান এসে নামলো সেখানে। যানটা কতকটা হেলিকপ্টারের মত দেখতে। কয়লার চাপগুলোর পাশে নামলো যানটা। এত ঘন জঙ্গলের মধ্যে উড়ন্ত যানটা অনায়াসে প্রবেশ করলো দেখে অবাক হলো দিপালী।

যানটা ততক্ষণে এসেছে নিচে।

কয়লার স্তূপের পাশে থেমে পড়লো।

এবার যানের ভিতর থেকে নেমে এলো একটি জমকালো পোশাকপরা মানুষ। হাতে তার একটা রিভলভার, মুখে মুখোশ। শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিলো।

লোকটা অদ্ভুত যান থেকে নেমে এসে দাঁড়ালো থেমে থাকা বগিগুলোর দিকে। প্রথমেই তার দৃষ্টি পড়লো দিপালীর উপর। দিপালীকে দেখামাত্র মুখোশের মধ্যে চোখ দুটো তার জ্বলে উঠলো।

দিপালীর কাছে এগিয়ে এসে বললো—এটা কি?

একজন বললো—মালিক, এ মেয়েটি অসহায়।

অসহায় কি রকম? মুখোশপরা লোকটা বললো।

বললো একজন—মেয়েটিকে কোনো দুষ্কৃতিকারীদল নাকি ধরে এনেছে। সে ভয়ে পালিয়ে এসে আমাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। আমরা কোনো...... .

তোমরা কোনো ভরসা দিতে পারোনি, এই তো?

ঠিক তা নয়।

বুঝেছি তোমরা কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হওনি, এই তো?

হাঁ, মালিক।

যাও, আমি কথা দিলাম ওকে আশ্রয় দেবো। দিপালীকে লক্ষ্য করে বললো—এসো, এদিকে এসো।

দিপালী অসহায় চোখে তাকালো মুখোশপরা মালিকের মুখ খানার দিকে।

মালিক এবার সবাইকে লক্ষ্য করে বললো—তোমরা কাজ শেষ করো।

পাশের একটা গাছের গোড়ায় এসে দাঁড়ালো মালিক এবং গাছটার গায়ে চাপ দিলো। অমনি কিছুটা ছাল সরে গেলো এক পাশে।

বেরিয়ে এলো একটা সুইচ।

ঠিক সুইচ নয়, একটা চক্রাকার প্যাঁচ জাতীয় যন্ত্র।

মালিক সেই প্যাঁচটার মধ্যে আংগুল রেখে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে গাছটার গোড়ায় বেরিয়ে এলো একটা সুড়ঙ্গপথ।

মুখোশপরা লোকটা একটা বাঁশি বের করে ফুঁদিলো।

বিস্ময়কর ব্যাপার, অমনি এক এক করে বেরিয়ে এলো কতকগুলো লোক। সবার পিঠেই স্পঞ্জের প্যাকেট।

স্পঞ্জের প্যাকেট নিয়ে লোকগুলো খালি বগিতে উঠে পড়লো। ততক্ষণে সমস্ত বগি থেকে কয়লার চাপ নামিয়ে ফেলা হয়েছে।

শুধু স্পঞ্জের প্যাকেট নয়, অনেকের পিঠে ভারী প্যাকেট রয়েছে। ভারী প্যাকেটগুলো নিচে রেখে স্পঞ্জের প্যাকেট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। এমন নিখুঁতভাবে ঢেকে দেওয়া হলো যাতে কেউ বুঝতে না পারে ঐ স্পঞ্জের প্যাকেটগুলোর তলায় কোনো মূল্যবান বস্তুর প্যাকেট আছে।

যারা দু'জন পূর্বে পথিমধ্যে প্যাকেট কাঁধে উঠে এসেছিলো তাদের সহ দিপালীকে নিয়ে সুড়ঙ্গপথে পা বাড়ালো মুখোশধারী লোকটা।

এদিকে বগিগুলো থেকে ইঞ্জিন খুলে পিছন দিকে সংযোগ হবার জন্য অপর লাইন ধরে এগিয়ে চললো।

যানটা কয়লা স্তূপের আড়ালে রয়ে গেলো।

বনহুর ঝোপের আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করছে। এবার সে আসল স্মাগলারের খোঁজ পেয়েছে। বনহুর নিজ হাতের ঘড়িটার চাবি ঘুরিয়ে দিলো। কি যেন বললো ঘড়িটার কাছে মুখ নিয়ে।

তারপর চাবি ঠিক করে নিয়ে হাতের উপর জামাটা টেনে নামিয়ে দিলো।

এবার বনহুর দেখতে পেলো দিপালী সহ জমকালো মুখোশপরা লোকটা গাছের সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলো।

অন্যান্য লোক যারা খালি বগির মধ্যে স্পঞ্জের প্যাকেটগুলো তুলে গুছিয়ে দিলো তারাও পরে প্রবেশ করলো ঐ সুড়ঙ্গে।

জায়গাটা সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে গেলো।

ইঞ্জিনটা বগিগুলোকে টেনে নিয়ে চলে গেলো দূরে অনেক দূরে।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো বনহুর—কেউ নেই, শুধু সেই অদ্ভুত যানটা রয়েছে সেখানে।

বেরিয়ে এলো বনহুর ঝোপটার ভিতর থেকে। তারপর দ্রুত যানটার পাশে এসে দাঁড়ালো, অতি সহজেই দরজা খুলে প্রবেশ করলো ভিতরে। দেখলো একটা ঝুড়ি একপাশে ঢাকা, একটা তোয়ালেও রয়েছে। আর রয়েছে দুটো ফ্লাক্স। একটায় পানি, আরেকটায় কফি, বনহুর ক্ষুধার্ত ছিলো, মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে ঝুড়িটা খুলে ফেললো। সে জানে ঐ ধরনের ঝুড়ির মধ্যে কি পাওয়া যেতে পারে। ঝুড়ির ঢাকনা খুলে ফেলতেই নজরে পড়লো তাজা ফল রয়েছে ঝুড়িটার মধ্যে।

বনহুর ইচ্ছামত ফল খেলো। একটি টিফিন বক্স ছিলো পাশে, সেটা খুলে ফেলতেই দেখলো, তার মধ্যে আছে রুটি আর মাখন। রুটিতে মাখন লাগিয়ে খেলো কিছুটা। তারপর কফির ফ্লাক্স খুলে ঢেলে নিলো গরম কফি। আরামে পান করলো।

কয়েকদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর বনহুর আজ পেট পুরে খেলো অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে।

ওদিকে তখন মুখোশ ও অদ্ভুত পোশাকপরা লোকটা দিপালীকে নিয়ে সুড়ঙ্গপথ ধরে অগ্রসর হয়েছে।

অন্যান্য লোক যারা স্পঞ্জের প্যাকেট বহন করে খালি বগিগুলো পূর্ণ করেছিলো তারা অপর পথে নেমে গেলো নিচে।

দিপালী ভালভাবে সবকিছু লক্ষ্য করছে আর এগুচ্ছে।

অবাক সে কম হয়নি, যে সুড়ঙ্গপথে সে এগিয়ে যাচ্ছে তা অতি আশ্চর্যকর। ভালভাবে পথ চিনে রাখছিলো সে।

এক সময় একটা গুহাজাতীয় ঘরে এসে দাঁড়ালো মুখোশপরা লোকটা।

দিপালী অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখছে চারদিকে।

লোকটা বললো—ভয় পাচ্ছো?

দিপালী বললো—আপনি আমার আশ্রয়দাতা, আপনি পাশে থাকতে আমার কোনো ভয় নেই। তাছাড়া ঈশ্বর আমার সহায় রয়েছেন।

হা হা করে হেসে উঠলো অদ্ভুত লোকটা, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—ঈশ্বর! দুর্গম গুহামধ্যে ঈশ্বর আসবে তোমাকে রক্ষা করতে।

আশ্চর্য দৃষ্টি নিয়ে তাকালো দিপালী, মুখোশঢাকা মুখটার দিকে। চোখ দুটো জ্বলছে তার, যেন দুটো আগুনের বল।

দিপালী তাকিয়ে দেখলো কেউ নেই, তার আশেপাশে পাষাণ প্রাচীর। মশালের আলো জ্বলছে। দিপালী বললো—আপন আশ্রয়দাতা, কাজেই......

আমি তোমার ঈশ্বর বলতে পারো।

দিপালী নিশ্চুপ।

বললো লোকটা—তোমাকে আমি চাই......এগুতে লাগলো লোকটা।

দিপালীর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠলো, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য। তক্ষুণি মুখে হাসি টেনে বললো—আমি রাজি আছি। আপনি যা বলবেন তাই করবো কিন্তু...

বলো কিন্তু কি? থামলে কেন বলো?

আমি যা চাইবো আমাকে দেবেন?

নিশ্চয়ই দেবো, বলো কি চাও তুমি?

চাই আপনার ভালবাসা আর......

বলো?

আর অর্থ-অলংকার।

অলংকার! কত নেবে তাই দেবো।

সত্যি?

হাঁ।

আমাকে আগে দেখান, আমি নিজকে আপনার বাহুডোরে বিলিয়ে দেবার পূর্বে আমি দেখতে চাই, আমার সবকিছুর বিনিময়ে আমি কি পাবো।

বেশ, চলো আমার সঙ্গে। লোকটা দিপালীকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলে ওদিকের দেয়ালের ধারে এগিয়ে গেলো।

দিপালী তাকে অনুসরণ করলো।

দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়ালো লোকটা।

সুইচে চাপ দিতেই দেয়ালের কিছু অংশ সরে গেলো এক পাশে।

দিপালীকে লক্ষ্য করে বললো—ঐ দেখো।

দিপালী দৃষ্টি ফেললো দেয়ালের ওপাশে গুহাটার মধ্যে। দু'চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠলো তার, দেখলো গুহার মেঝেতে সোনার অলংকারের স্তূপ আর অসংখ্য হীরা-মতি। হীরা আর মতিগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

আরও অনেক মূল্যবান বস্তু নজরে পড়লো। দিপালী অবাক হয়ে দেখছে, তখন বললো লোকটা—যা চাও তাই দেবো।

সত্যি! সত্যি দেবেন?

হাঁ। এসো এবার আমার সঙ্গে.,....

কিন্তু......

কি—কিন্তু কি?

আপনার মুখোশপরা মুখ দেখে আমার বড় ভাল লাগছে।

না, তুমি আমার মুখ দেখতে পাবে না।

তাহলে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?

তুমি আমাকে বোকা মনে করো না।

কি যে বলেন, আমি আপনাকে বোকা মনে করবো কেন? আমি এক অসহায় নারী......

আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো লোকটা, তারপর দিপালীর হাত জোরপূর্বক ধরে ফেললো।

দিপালী উপায়হীন, এখন একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া তার বাঁচবার কোনো উপায় নেই।

লোকটা কঠিন হাতে চেপে ধরলো দিপালীকে।

দিপালী বললো—আপনি আমায় স্পর্শ করবেন না, আমি চাই আপনার আমার মিলন হবে পবিত্র, তাই.....

তুমি চাও আমাকে বিয়ে করতে?

হাঁ হাঁ, তাই চাই।

কিন্তু আমি কে তুমি জানো না।

তা আমি জানতে চাই না। যে আমাকে উদ্ধার করেছে তাকে আমি সব দিতে পারি—আমার জীবন-মন সবকিছু।

দিপালীর কণ্ঠস্বরে ছিলো আবেগ। হয়তো সে কারণেই হবে মুখোশের নিচে চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে এলো। বললো লোকটা—বেশ, তাই হবে—চলো।

কোথায়?

যেখানে আমি থাকি।

কোথায় থাকেন আপনি? বললো দিপালী।

লোকটা বললো—গেলেই বুঝতে পারবে।

এ্যাঁ, আমি গেলেই বুঝতে পারবো?

হাঁ।

এ বেশ জায়গা। আমার বড্ড পছন্দ হয়েছে।

জানি এ জায়গা তোমার পছন্দ হয়েছে কিন্তু......

বলুন থামলেন কেন?

এখানে তোমাকে রাখা মোটেই সমীচীন নয়।

কেন?

তোমাকে বিশ্বাস নেই।

কেন? কেন? ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো দিপালী।

বললো লোকটা—বলছি, সব পরে জানতে পারবে। এসো আমার সঙ্গে।

এখানে আপনি থাকেন না? অসহায় কণ্ঠে বললো দিপালী।

লোকটা বললো—না, এখানে আমি থাকি না। এখানে আমার......না থাক, আজ নয়, পরে বলবো।

দিপালীর মনটা দমে গেলো, কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে এসেছে সে উদ্দেশ্য সফল হলো না। তারই প্রতীক্ষায় রয়েছে বনহুর গহন বনে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সে নিজে যেমন কাতর তেমনি কাতর বনহুর। দিপালীর বুকটা টনটন করে উঠলো। দিপালী তাকে কথা দিয়ে এসেছে এদের সন্ধান তাকে জানাবে, জানাবে গোপন কাজগুলোর খোঁজখবর কিন্তু সুযোগ তার এলো না।

লোকটা দিপালীকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। বিদায় মুহূর্তে দু'জন অনুচরকে ডেকে বললো—সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে আমি একটা মেয়েকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

মালিক, কি বলবো তাহলে?

বলবে জরুরি কাজে চলে গেছি।

আচ্ছা! বললো অনুচরদের একজন।

অপরজন বললো—অনেক কাজ ছিলো আপনার মালিক।

পরে এসে সব করবো।

মালগুলো চলে গেছে মালিক।

জানি।

দু'জন অনুচর পাঁচ পাউন্ড সোনা, আর পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের নীলমনি পাথর নিয়ে উধাও হয়েছে......

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো মুখোশপরা লোকটা—বলো কি

হাঁ মালিক।

ক্ষণিকের জন্য যেন থ' মেরে গেলো লোকটা, তারপর বজ্রকঠিন কণ্ঠে বললো—এ সংবাদ আমাকে জানানোর পূর্বে তাদের সন্ধান করে পাকড়াও করে আনতে পারোনি!

অনেক খোঁজ করা হয়েছে কিন্তু......

কোনো সন্ধান পাওনি, তাইনা?

হাঁ মালিক!

কঠিন দৃঢ়কণ্ঠে বললো লোকটা—যাও খোঁজ করো এবং যেখানে পাও পাকড়াও করে আনো। আমি এদের শরীরের চামড়া পা থেকে মাথা পর্যন্ত চিরে লবণ মাখিয়ে ছাড়বো।

যাও......

চলে গেলো লোক দু'জন।

মুখোশপরা লোকটা দিপালীর হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলো সুড়ঙ্গপথ ধরে বাইরে। কোনো বাধা দেবার মত ক্ষমতা ছিলো না তার, ক্ষুধার্ত ক্লান্ত অবসন্ন দিপালী অসহায়ের মতই তার সাথে এসে দাঁড়ালো।

বাম হাতের মুঠায় দিপালীর হাতখানা ধরা আছে। এসে দাঁড়ালো লোকটা তার অদ্ভুত যানটার পাশে। দ্রুতহস্তে যানটার দরজা খুলে দিপালীকে টেনে তুলে নিলো যানটার মধ্যে।

চালকের আসনে বসবার পূর্বে মুখোশপরা লোকটা দিপালীর হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো, তারপর তাকে একটা আসনে বসিয়ে দিয়ে বসে পড়লো চালকের আসনে।

অদ্ভুত যান।

একটা সুইচে চাপ দিতেই যানটা ভীষণ শব্দ করে উড়ে উঠলো আকাশে।

বৃক্ষলতা ঝোপঝাড় অতিক্রম করে বেরিয়ে এলো মুক্ত আকাশে। যানটা চলাকালে হেলিকপ্টারের মত এক ধরনের শব্দ হচ্ছিলো কিন্তু যতই উপরে উঠতে লাগলো ততই শব্দের বেগ কমে আসতে লাগলো।

আকাশে মেঘের উপর চলে গেলো যানটা।

মুখোশপরা ব্যক্তি দিপালীকে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে যানটাতে উঠে বসে ছিলো, সে কোনো দিকে খেয়াল করেনি। যদি সে খেয়াল করতো তাহলে বুঝতে পারতো যানটির মধ্যে অপর কেউ প্রবেশ করেছিলো তার স্পষ্ট চিহ্ন ঝুড়িটার ঢাকনা যদি সে তুলে দেখতো তাহলে সে মুহূর্তে বুঝে নিতো কিন্তু কোনোদিকে সে খেয়াল করেনি বা করবার মত ফুরসৎ পায় নি।

সম্মুখে দিকদর্শন মেশিন।

যানটা তখন কোন্‌দিকে চলেছে, কত স্পীডে চলেছে, সেইদিকে তার দৃষ্টি রয়েছে।

দিপালীর হাত দু'খানা বাঁধা থাকায় সে নিরুপায়ভাবে বসেছিলো একটা আসনে। ভাবছে দিপালী তার রাজকুমারের কথা। নিশ্চয়ই রাজকুমার তাকে লক্ষ্য করেছে। লোকটা তাকে নিয়ে অদ্ভুত যানে বসলো তবু তিনি নীরব

রইলেন? দুঃখ-ব্যথায় দিপালীর মনটা মুষড়ে উঠলো। রাজকুমার দেখেও তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন না? তবে কি তিনি দেখেননি তাকে? ঐ সময় কি তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন। না না, তিনি অন্যমনস্ক থাকতে পারেন না, তিনি সজাগ প্রহরীর মত তীক্ষ্ণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ......

যানটা মেঘের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে।

দু'পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে মেঘের মিছিল। সূর্যের আলোকরশ্মিতে মেঘগুলো ভাসমান পালতোলা নৌকার মত লাগছে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দিপালীর কানে, সঙ্গে সঙ্গে চমকে ফিরে তাকালো সে—একি, বিস্ময়ে আনন্দে দিপালীর বুকটা ধক্ করে উঠলো অস্ফুট কণ্ঠে বললো—রাজকুমার.......

দেখলো একখানা সূতীক্ষ্ণধার ছোরা সেই মুখোশপরা চালকের পাঁজরে চেপে ধরে কঠিন কণ্ঠে বললো বনহুর—তোমার যানটার মুখ দক্ষিণ দিকে ফিরাও...

পৃথিবীর বুক থেকে হাজার হাজার ফুট উপরে শূন্যে রাজকুমার এলো কি করে? দিপালীর দু'চোখে শুধু বিস্ময়ই নয়, একরাশ আনন্দ উচ্ছ্বাসও। হাত দু'খানা তার পিছমোড়া করে বাঁধা, তাই নিজ আসনে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে দিপালী।

হঠাৎ কোথা থেকে এলো তার যম ভেবে পেলো না লোকটা। যানটার হ্যান্ডেল চেপে ধরে থাকলেও মুহূর্তের জন্য হাত দু'খানা কেঁপে উঠলো তার ফিরে তাকিয়ে দেখে নিলো একবার, তারপর নিশ্চুপ রইলো। ওর মনেও যে ভীষণ ঝড় উঠেছে তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বনহুর ছোরাখানা লোকটার পাঁজরে ধরে রেখে বললো—একদা ও নড়বে না, সাবধানে তোমার যানটার দক্ষিণ দিকে ফেরাও। বনহুরের দৃষ্টি চালকের সম্মুখস্থ দিকদর্শন যন্ত্রটার দিকে। পুরো স্পীডে যানটা চলেছে মেঘের উপরে। জাম্পিং হচ্ছে যানটি। ভীষণভাবে দুলছে ভিতরের মানুষগুলো।

বনহুর ছোরা পেলো কোথায় ভাবলো দিপালী, কারণ তাকে যখন ক্যারিলং-এর অনুচরগণ বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো তখন তার সঙ্গে যা ছিলো সব কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো। ছোরা হাতে যানটার চালককে আক্রমণ বিস্ময়কর না হলেও ছোরা খানা বিস্মিত করে তুলেছিলো। আরও অবাক হয়েছিলো দিপালী হাজার হাজার ফুট উপরে বনহুরকে দেখে।

কিন্তু বিস্ময় তার দূর হলো না, বরং আরও বেড়ে চললো।

অবাক চোখে দেখছে দিপালী।

বনহুরের চোখে এক ভীষণ কঠিন ভাব ফুটে উঠেছে, সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা সূর্যের আলো পড়ে মাঝে-মাঝে চক্ চক্ করে উঠছে।

চালক বসে আছে হ্যান্ডেল চেপে ধরে। যদিও তার মুখমন্ডল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবু তার হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে সে অকস্মাৎ এ অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলো না এবং সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বনহুর পুনরায় বলে উঠলো—তবু শুনলেনা আমার কথাটা......ঠিক ঐ মুহূর্তে চালক হ্যান্ডেল ছেড়ে প্রচণ্ড এক ঘুষি লাগিয়ে দিলো বনহুরের চোয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে যানটা কাৎ হয়ে গেলো ঘুরপাক খেয়ে।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো বনহুর চালকের পাশের আসনটার উপর কিন্তু পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়ালো সে, দক্ষিণ হাতে তার ছোরাখানা এখনও ধরা আছে। উঠে দাঁড়াবার পরক্ষণেই মুখোশধারী ব্যক্তি ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হলো।

বনহুর ছোরাখানা ফেলে দিলো, তারপর সেও প্রস্তুত হয়ে হাত বাড়ালো।

ততক্ষণে মুখোশধারী লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।

বনহুর এবার ধরে ফেললো লোকটাকে এবং তার চোয়ালে বসিয়ে দিলো এক প্রচণ্ড ঘুষি।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো ইঞ্জিনটার পাশে। যানটা তখন ওলট-পালট হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

দিপালীর হাত দু'খানা পিছমোড়া বাঁধা থাকায় সে কিছু আঁকড়ে ধরতে পারলো না, সেও লুটোপুটি খাচ্ছে মেঝেতে। শুধু মেঝে নয়, ছাদখানাও কোনো সময় নিচে এসে যাচ্ছে, কোনো সময় উপরে। আবার কখনও বা ঘুরপাক খেয়ে কাৎ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেন রাখাল বালকের হাতে উড়ানো বেয়াড়া ঘুড়ির মত।

সেকি ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়েছে অদ্ভুত যানটার মধ্যে।

দিপালীর অবস্থাও শোচনীয়।

দেহটা তার বারবার আঘাত খাচ্ছে আসনে, কখনও বা ইঞ্জিনে, কখনও যানটার ছাদে। এলোমেলো হয়ে গেছে তার পরিধেয় বসন।

ছোরাখানা পড়ে আছে মেঝেতে।

মুখোশধারী লোকটা ছোরাখানা বারবার তুলে নেবার চেষ্টা করছে কিন্তু সে সুযোগ সে পাচ্ছে না। চালকবিহীন যানটা মহাশূন্যে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ভেসে চলেছে। এত উপরে উঠে এসেছে যানটা যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি কার্যকর নয়।

বনহুর আর অদ্ভুত চালক প্রাণপণে লড়াই করে চলেছে।

মুখোশের অন্তরালে কোন্ মুখ আছে, সে এই স্মাগলার বনহুর জানতে চায়।

আর মুখোশধারী চায় দস্যু বনহুরকে যান থেকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করতে। কোনোক্রমে সে যদি ওকে যান থেকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করতে পারে তাহলে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, আর কোনোদিন ও পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতে পারবে না। মহাশূন্যে ভেসে বেড়াবে তার দেহটা, তারপর একদিন বিলীন হয়ে যাবে সে। শুধু তার নশ্বরদেহটার ধূলিকণা ভেসে বেড়াবে মহাশূন্যের নিস্তব্ধতায়।

কিন্তু সে পারছে না বনহুরকে যান থেকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করতে। ভীষণ ধ্বস্তাধস্তি চলেছে।

যানটা তখন গ্যাসভরা বেলুনের মত ওলট-পালট করতে করতে উপরের দিকে উঠে চলেছে।

দিপালী কখনও মেঝেতে, কখনও আসনে, ছাদে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

বনহুর আর মুখোশপরা লোকটা মরিয়া হয়ে লড়াই করছে। কেউ কাউকে পরাজিত করতে সক্ষম হচ্ছে না।

বনহুরকে অকস্মাৎ জাপটে ধরলো মুখোশধারী লোকটা।

বনহুর প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো ওর চোয়ালে, সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়লো ওর মুখের মুখোশখানা। চমকে উঠলো বনহুর আর দিপালী।

বনহুর বলে উঠলো—ক্যারিলং তুমি...মুখোশের অন্তরালে তুমিই লুকিয়ে ছিলে নরপশু......

পরক্ষণেই ভীষণ আক্রোশে বনহুর ঘুষির পর ঘুষি চালিয়ে চললো ক্যারিলং-এর নাকে-মুখে চোয়ালে।

অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো ক্যারিলং।

মুখোশ খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যারিলং ভীষণ দমে গেলো। তার ওষ্ঠদ্বয় কেটে তাজা লাল রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। চোয়াল ফুলে উঠেছে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে।

নরপিচাশটা আজীবন অসৎ কাজে লিপ্ত ছিলো, আজ সে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। এতদিন কোনো শক্তিই তাকে কাহিল করতে পারেনি।

আজ ক্যারিলং কো চোখে সর্ষের ফুল দেখছে। সে চেয়েছিলো নিজকে গোপন করে দিপালীকে তাদের সেই ভয়াবহ যমপুরীতে নিয়ে গিয়ে মিস লুনার মত তাকে নির্মমভাবে হত্যা করতে কিন্তু তার পূর্বেই সব প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে গেলো। শুধু দিপালীর কাছেই সে আত্মগোপন করার চেষ্টা চালায় নি, চালিয়েছে তার অনুচর বা দলের লোকদের কাছেও।

কিন্তু সব কিছু নস্যাৎ হতে চলেছে।

মুখোশই শুধু খসে পড়েনি খসে পড়েছে তার জীবনের সব গোপন রহস্য। বনহুর এতদিন যে স্মাগলার ও ধ্বংসকারীকে খুঁজে ফিরছিলো, এ সেই নরপশু ক্যারিলং। হয় নিজে মৃত্যুবরণ করবে, নয় ওকে খতম করবে।

বনহুরের রক্তে আগুন ধরে গেছে।

মিস লুনাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এই নরশয়তান, তাই বনহুর উন্মাদ হয়ে উঠলো। তাকে তখন ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় মনে হচ্ছিলো।

বনহুর এবার ক্যারিলং-কোর ঘাড় ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো তারপর লাগালো আবার এক ঘুষি। সেই মুহূর্তে এক কান্ড ঘটে গেলো। বনহুরের ঘুষি খেয়ে ক্যারিলং ছিটকে গিয়ে পড়লো যানটার জানালার কাঁচের উপর। আমচকা ক্যারিলং-এর দেহের প্রচণ্ড ধাক্কায় যানটার জানালার কাঁচ ভেঙে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যারিলং যান থেকে পড়ে গেলো বাইরে।

একটা তীব্র আর্তনাদ শোনা গেলো, ততক্ষণে যানটা ঘুরপাক খেয়ে আরও কিছুটা উঠে গেলো উপরে।

বনহুর তাকালো কাচের আবরণের নিচের দিকে। সে দেখতে পেলো ক্যারিলং-এর দেহটা ভাসমান সমুদ্রে সাঁতার কাটছে।

যানটার মধ্যে অক্সিজেন ভর্তি ছিলো, তাই হাজার হাজার ফুট উপরেও নিঃশ্বাস নিতে তাদের কোনো কষ্ট হচ্ছিলো না। কাঁচ ভেঙে যাওয়ায় সেই ফাঁক দিয়ে অক্সিজেন বেরিয়ে যাচ্ছিলো। বনহুর দ্রুত সেই জায়গায় একটা আঁঠালো কাগজ বসিয়ে দিলো।

এ ধরনের কিছু কাগজ এ ব্যাপারেই যানটার মধ্যে সংরক্ষিত ছিলো একটা বনহুর পূর্বেই দেখে নিয়ে ছিলো। ঐ আঁঠালো কাগজগুলোর পিছনেই লুকিয়ে ছিলো বনহুর। সুযোগ বুঝে বেরিয়ে এসেছিলো সে, ছোরাখানাও বনহুর ফলের ঝুড়ির মধ্যে আবিষ্কার করেছিলো।

ক্যারিলং-কো-কে নিক্ষেপ করার পরপরই আঁঠালো কাগজখানা লাগিয়ে দেয় বনহুর ভাঙা জানালায়, তারপরই যানটির ইঞ্জিনের হাতল চেপে ধরে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে।

অদ্ভুত যানটা ঘুরপাক খেয়ে এবার সোজা হয়ে গেলো কিন্তু একচুল আর এগুলো না।

দিপালীর দিকে তাকিয়ে দেখলো দিপালী উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। হাত দু'খানা এখনও তার পিছমোড়া বাঁধা রয়েছে, দেহের বসন খসে পড়েছে। তার এলোমেলো বেশ বনহুরকে দুঃখ দিলো, বললো—দিপালী, এ মুহূর্তে হ্যান্ডেল ছেড়ে দিলে পুনরায় যানটা উল্টে যাবার সম্ভাবনা আছে। তুমি ছোরাখানা দাঁত দিয়ে তুলে নিয়ে আমার পাশে এসো, আমি তোমার হাতের বাঁধন কেটে দেবো......

দিপালী বনহুরের কথামত উবু হয়ে যানটার মেঝে থেকে ছোরাখানা দাঁত দিয়ে তুলে নিলো এবং কোনোক্রমে এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে।

দিপালীর আঁচলখানা খসে পড়েছে।

জামার স্থানে স্থানে ছিঁড়ে দেহের কিছু কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। বনহুরের পাশে এসে দাঁড়াবার পর বনহুর ডান হাতে যানটার হ্যান্ডেল চেপে ধরে বাম হাতে দিপালীর হাতের বাঁধন কেটে দিলো!

হাত দু'খানা মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিপালী বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে চুমু খায় তার প্রশস্ত ললাটে। ভুলে যায় দিপালী ঐ মুহূর্তে রাজকুমারের সঙ্গে তার সম্পর্ক। ভুলে যায় সে নগণ্য একজন নর্তকী আর সে দস্যু সম্রাট। আনন্দের আতিশয্যে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে সে।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সে বুঝতে পারলো দিপালী ক্যারিলং-এর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে এক অনাবিল আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। হারিয়ে ফেলেছে সে নিজের সাধারণ অনুভূতি।

পরক্ষণেই অবশ্য দিপালীর সম্বিৎ ফিরে এলো, লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো তার মুখমন্ডল। বনহুরের কণ্ঠ মুক্ত করে দিয়ে সরে দাঁড়ালো সে।

বনহুর বললো—জানি খুব খুশি হয়েছো। কিন্তু বিপদ এখনও আমাদের কাটেনি, কারণ আমরা এখন পৃথিবী থেকে হাজার হাজার ফুট উপরে। এখানে কোনো অক্সিজেন নেই, কোনোক্রমে যদি যানের মধ্য হতে অক্সিজেন বেরিয়ে যায় বা ঐ ধরনের কোন বিপদ এসে যায় তাহলে আমাদেরও ঐ নরপশু ক্যারিলং-এর মত অবস্থা হবে।

দিপালী নিশ্চুপ হয়ে শুনছিলো।

বনহুর বললো—দিপালী, ভেবে লাভ হবে না। তুমি ঐ ঝুড়ি খুলে ফেলো ওর মধ্যে কিছু ফল আছে খাও। তোমার অত্যন্ত ক্ষুধা পেয়েছে আমি জানি। বনহুর হ্যান্ডেল চেপে ধরে কথাগুলো বলছিলো।

দিপালী বিলম্ব করছিলো, তাই বনহুর একটু রাগতভাবে বললো—দিপালী, তোমার বিলম্ব করা মোটেই উচিত হচ্ছে না, কারণ আমরা এখন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছি। হয়তো বা খাবার সময় আর নাও আসতে পারে।

আমি পেট ভরে ফল এবং পানি খেয়েছি। ঐ ঝুড়ির মধ্যে বহু ফল ছিলো এবং কিছু এখনও আছে, তুমি খেয়ে নাও।

দিপালী গিয়ে ঝুড়ির ঢাকনা খুলে ফেললো এবং বের করে কিছু ফল। ফিরে এলো সে বনহুরের পাশে।

বনহুর বললো—খেয়ে নাও।

দিপালী বললো—আমি খাবার পূর্বে আপনি একটু খান।

বললাম তো অনেক খেয়েছি...

কিন্তু ক্যারিলং-এর সঙ্গে আপনি যেভাবে লড়াই করেছেন তাতে ও খাবার অনেকক্ষণ হজম হয়ে গেছে।

মোটেই না। আমি একটুও ক্ষুধা অনুভব করছি না। বরং তুমি খাবার পর যা থাকে যত্ন করে রেখে দাও, কারণ কতক্ষণ আমাদের এভাবে কাটাতে হবে কে জানে। বনহুরের কথা শেষ হলো।

দিপালী সত্যই বড় ক্ষুধার্ত ছিলো, সে কিছু ফল খেলো।

বনহুর বললো—যাও ঐ ফ্লাক্সটার মধ্যে কিছু পানি আছে, পান করো।

দিপালী কোনো কথা না বলে পানি পান করলো। কিন্তু ফ্লাক্সে বেশি পানি না থাকায় সামান্য পানি সে পান করলো! দিপালী ভাবলো যেমন করে হোক তাদের বাঁচতে হবে, বিশেষ করে রাজকুমারকে বাঁচাতেই হবে।

দিপালী তাকালো যানটার চালকের আসনে উপবিষ্ট দস্যু বনহুরের দিকে। দৃষ্টি সে সহসা ফিরিয়ে নিতে পারে না। ক্যারিলং-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে এলোমেলো হয়ে পড়েছিলো তার চুলগুলো। কিছু ছড়িয়ে পড়েছে কপালে। প্রশান্ত দীপ্ত মুখমন্ডল। দিপালী চোখ দুটোকে ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না।

একটা সুস্বাদু ফল তুলে নিয়ে এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে, বললো—খেতে হবে।

না থাক। বললো বনহুর।

দিপালী বললো—আমি ছুরি দিয়ে কেটে আপনার মুখে তুলে দিচ্ছি, আপনি খেয়ে নিন।

বেশ, যদি খুশি হও, দাও!

দিপালী ছুরিখানা তুলে নিয়ে ফলটা কেটে টুকরো টুকরো করে বনহুরের মুখে তুলে দিতে লাগলো।

বনহুর হেসে বললো—সত্যি নারী জাতির স্নেহ মায়া-মমতার তুলনা হয় না। দিপালী, বললাম আমি ক্ষুধার্ত নই তবু তুমি আমাকে না খাইয়ে ছাড়লে না।

দিপালী কোনো জবাব দিলো না।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো তাদের। বনহুর এ ধরনের যানবাহন চালানো ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবু সে কিছুটা সামলে নিতে পারছিলো। সে বিমান চালাতে জানতো তাই রক্ষা; না হলে হ্যান্ডেল ধরতেই পারতো না সে।

বললো বনহুর—দিপালী, আমরা এখনও বাঁচতে পারি যদি কোনোক্রমে যানটাকে হাজার ফুট নিচে নামিয়ে নিতে সক্ষম হই। কিন্তু সক্ষম হবো কিনা জানি না।

দিপালী পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো সবকিছু। সে বেশ বুঝতে পারছিলো মৃত্যু তাদের সুনিশ্চিত, কারণ যানের মধ্যে যে অক্সিজেন আছে তা ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে!

বনহুর প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে চলেছে যানটিকে নিচে নামিয়ে নেবার জন্য। যানটি স্থির হয়ে গেছে, যদিও এতক্ষণ উপরেই যাচ্ছিলো আর উল্টাপাল্টাভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিলো, কিন্তু এবার ভাসমান কোনো বস্তুর মত স্থির হয়ে গেছে যানটি।

কোন্ সুইচে চাপ দিলে উপরে উঠবে আর কোন্ সুইচে চাপ দিলে নিচে নামবে, ঠিকমত বনহুর বুঝতে না পারায় বেশ অসুবিধায় পড়লো। যানটি সম্পূর্ণ নতুন এবং অদ্ভুত ধরনের।

বনহুর সম্মুখের একটি সুইচে চাপ দিতেই যানটি দুলে উঠলো এবং সাঁ সাঁ করে উপরে উঠতে লাগলো। দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বনহুরের চোখ দুটো।

দিপালীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হলো, সে ধরে ফেললো বনহুরের কাঁধটা।

বনহুর বললো—ভয় নেই দিপালী, মরতে যখন একদিন হবেই তখন না হয় মরলাম।

রাজকুমার, এভাবে মৃত্যু...

তুমি চাও না, তাইনা?

রাজকুমার, আমি নিজের জন্য ভাবছি না, ভাবনা আপনার জন্য।

বনহুর তার স্বভাবমত হেসে উঠলো হা হা করে। তারপর হাসি থামিয়ে বললো—আমার জন্য ভাবনা! দিপালী, সর্বদা মৃত্যুর সঙ্গে যাকে মোকাবেলা করে চলতে হয় তার জন্য আবার ভাবনা কি? জানি না আমরা এখন কোথায় চলেছি......কথা শেষ হয় না বনহুরের, হঠাৎ ঘুরপাক খেয়ে যানটা উল্টে যায়।

বনহুর আর দিপালীও গড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ এমনভাবে যানটা উল্টেগেলো কেন তাও বোঝা গেলো না।

পর পরই থেমে গেলো যানটা আচমকা হোঁচট খেয়ে।

বনহুর আর দিপালী মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো মেসিনের উপরে।

দিপালীর কপালে আঘাত লেগে কেটে গেলো খানিকটা, রক্ত গড়িয়ে পড়লো এলোমেলে চুল বেয়ে।

বনহুর আর দিপালী উঠে দাঁড়ালো।

আনন্দে চিৎকার করে উঠলো বনহুর—দিপালী, আমাদের যানটা কোনো বস্তুর উপরে বা গায়ে লেগে থেমে গেছে।

দিপালীও বুঝতে পারলো তাদের যান কোনো এক বস্তুর সঙ্গে লেগে গেছে।

বললো বনহুর—আমরা চাঁদের কাছাকাছি কোনো এক গ্রহে পৌঁছে গেছি। খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো বনহুর কিন্তু দিপালীর দিকে এতক্ষণ সে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পায়নি। এবার দিপালীর উপর চোখ পড়তেই শিউরে উঠলো, তাজা লাল রক্তে দিপালীর কপাল রাঙা হয়ে উঠেছে, চুল বেয়ে রক্ত ঝরছে।

বনহুর দ্রুত দিপালীর নিকটে এসে বললো—সর্বনাশ, এতটা কেটে গেছে......তাড়াতাড়ি দিপালীর আঁচল ছিড়ে বেঁধে দিলো সে দিপালীর কপালটা যত্ন সহকারে।

বনহুর যখন দিপালীর কপালে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিলো তখন দিপালীর গন্ড বেগে গড়িয়ে পড়ছিলো অশ্রুধারা। জীবনে কোনো দিন কেউ বুঝি তাকে এমনভাবে দয়া জানায় নি। বারবার তার লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছিলো বনহুরের পায়ে।

বনহুর বললো—জানি না দিপালী, এর চেয়ে আরও কত দুঃখ আছে আমাদের ভাগ্যে।

সব দুঃখ-ব্যথা-বেদনা আমি সহ্য করতে পারবো রাজকুমার যদি আপনি আমার পাশে থাকেন।

দিপালী!

হাঁ, আমি সব মেনে নিয়েছি; সব মেনে নিয়েছি। নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি আপনার চরণে।

হাসলো বনহুর।

দিপালী বলেই চলেছে—মিস লুনা যদি প্রাণ দিতে পারে, আমি কেন পারবো না রাজকুমার।

দিপালী, মিস লুনা নাম উচ্চারণ করো না, ঐ নাম আমি সহ্য করতে পারি না। মিস লুনার মৃত্যু আমাকে শুধু ব্যথিতই করেনি, আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি...

বনহুরের চোখ দুটো ছল ছল হয়ে উঠলো।

দিপালী চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। ভাবলো মিস লুনা সত্যি ভাগ্যবতী, তার কথা ভেবে আজ দস্যু সম্রাটের চোখেও পানি। দিপালীর মরতে ইচ্ছা করছে, কেন সে মরেনি...

কি ভাবছো দিপালী?

কিছু না।

বনহুর আংগুল দিয়ে দিপালীর চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে—কেঁদো না, যে চলে যাবার গেছে তবে দুঃখ হয় মিস লুনাকে আমরা এমন এক অবস্থায় হারালাম যা ভাবতেও শরীর শিউরে উঠে। যাক ও সব, এখন নিজেদের অবস্থা নিয়ে ভাবতে হবে। যানটির মধ্যে যা খাদ্য বা পানীয় আছে তা বড়জোর দু'চারদিন চলতে পারে।

হাঁ, তাইতো ভাবছি।

কিন্তু ভেবে কোনো ফল হবে না দিপালী। আমরা এখন যে স্থানে এসে পৌছেছি ঐ স্থানটিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে আমরা এখন কোথায়। বনহুর কথা শেষ করে যানটির শার্শীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

অদ্ভুত যানটি সম্পূর্ণ শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। শুধু সম্মুখভাগ ঢেকে রয়েছে একটি অদ্ভুত পর্বতের গায়ে। আকাশের মাঝামাঝি পর্বত-সত্যি বিস্ময়কর বটে!

বনহুর বললো—এটা পর্বত না কোনো গ্রহ ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে চাঁদের দেশও হতে পারে।

দিপালী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো—চাঁদের দেশ, বলেন কি রাজকুমার!

হাঁ, সেই রকমই মনে হচ্ছে কিন্তু চাঁদের দেশ এত প্রাণহীন কেন? শুধু উঁচুনীচু অসমতল পাথরের স্তূপ......অবাক হয়ে দেখতে থাকে বনহুর।

দিপালী তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তারা পৃথিবী ছেড়ে কোটি কোটি মাইল উপরে উঠে এসেছে। যে চাঁদের বুকে একদিন পৃথিবীর মানুষ পা রেখেছিলো বা রাখতে সক্ষম হয়েছিলো, আজ তারা সেই চাঁদের দেশে এসে উপস্থিত হয়েছে। ক'দিন যে তারা এই অদ্ভুত যানে আছে তা মোটেই বুঝতে পারছে না। কারণ সূর্যোদয় তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। এখানে সৌরজগৎ এক সীমাহীন নীলের রাজ্য। বনহুর আর দিপালী কাঁচের শার্শীর ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে থাকে। কুয়াশাচ্ছন্ন ধূসর মেঘের মত লাগছে চাঁদের দেশটাকে।

বনহুর বললো—দিপালী, বড় ইচ্ছা হচ্ছে নামতে, কিন্তু......

বলুন রাজকুমার কিন্তু কি?

চাঁদের দেশে নামার জন্য পোশাক বা অক্সিজেনে ভরা মুখোস নেই যা পরে নামতে পারি।

হাঁ তা সত্য, আমরা নামতে পারছি না।

বনহুর কিছু ভাবলো, তারপর যানটির মধ্যে অনুসন্ধান চালালো। কিছু ফল আর পানি ছাড়া অন্যকিছু নজরে পড়লো না, যানটার মধ্যে সুন্দর

পরিচ্ছন্ন স্নানাগার রয়েছে, সেখানে কিছু পানি ধরা আছে। যানটি উলটপালট হলেও পানির পাত্র নষ্ট হয় নি।

বনহুর খুশি হয়ে বললো—ক্যারিলং যানটি অদ্ভুত উপায়ে তৈরি করেছে। মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে সে সৌরজগতে বিচরণ করে বেড়াতো এবং সুযোগ বুঝে পৃথিবীর বুকে ধ্বংসলীলা চালাতো।

কিন্তু কতদিন আমরা এখানে কাটাতে পারবো?

এই সবে তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত হলো। ফল ও পানি যা ছিলো তাও শেষ হয়ে এলো......কথা শেষ না করেই যানে ইঞ্জিনের পাশের আসনটায় বসে পড়লো বনহুর। হঠাৎ এক পাশে কাৎ হয়ে গেলো আসনটা, আসনটার নিচে একটা বাক্স বেরিয়ে পড়লো।

বনহুর আর দিপালী অবাক হয়ে গেলো।একটা ক্ষীণ আশা উঁকি দিলো তাদের মনে। না জানি ঐ বাক্সের মধ্যে কি জিনিস আছে।

বনহুর ঢাকনা খুলে ফেলতেই দেখলো তার মধ্যে কয়েকটা অদ্ভুত ধরনের পোশাক। বনহুর দ্রুতহস্তে পোশাকগুলো তুলে ধরে আনন্দে বলে উঠে—দিপালী, পেয়ে গেছি, যা চেয়েছিলাম পেয়ে গেছি......

চোখের সামনে মেলে ধরলো বনহুর পোশাকগুলো।

বেশি নয়, চারটা মাত্র অদ্ভুত পোশাক। বনহুর বললো—দিপালী, যে পোশাকগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো সৌরজগতের বিচরণ করবার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। আমার বাসনা পূর্ণ হবে এবার।

কিন্তু.....

বলো?

একেই আমরা বিপদে আছি, পুনরায় যদি কোনো বিপদের সম্মুখীন হই তাহলে?

এমন সুযোগ যখন এসেছে তখন অবেহেলা করা যায় না দিপালী।

❑

জায়নামাজে বসে দু'হাত তুলে দোয়া মাগছিলো মরিয়ম বেগম, গণ্ড বেয়ে তাঁর গড়িয়ে পড়ছিলো অশ্রুধারা। আজ কত দিন হলো মনিরকে তিনি দেখেন নি। একমাত্র সন্তান তাঁর, তাকে না দেখে এতদিন কি করে কাটানো যায়! একটা সংবাদও তিনি পাননি এতদিনের মধ্যে। সন্তানের চিন্তায় মরিয়ম বেগম ভেঙে পড়েছেন একেবারে। মাতৃহৃদয়ে নানা ভাবনা উঁকি দেয় অবিরত, কে জানে সে কোথায় আছে, কেমন আছে। কোনো অমঙ্গল হয়নি

তো? যদি কিছু ঘটে কে তাঁকে সে সংবাদ দেবে। রহমান আসতো মাঝে মাঝে—তার মুখে সংবাদ শুনতেন বা জানতে পারতেন। মায়ের মন তাতেই ভরে উঠতো, খুশি লাগতো তখন। যাক্ ভালই আছে তাঁর মনির। কিন্তু এখন যে তার কোনো খোঁজ খবরই পান না, কোথায় আছে তার হৃদয়ের ধন নয়নের মনি।

মরিয়ম বেগম আজকাল প্রায় ঘর থেকেই বের হন না। সব সময় তিনি খোদার এবাদতে মশগুল থাকেন। সংসারধর্ম পালন করতে গিয়ে তাঁকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তখন সবকিছু নীরবে সহ্য করেছেন। সহ্য করবার ক্ষমতাও ছিলো তাঁর তখন, কারণ বলিষ্ঠ বটবৃক্ষের মত পাশে তখন ছিলেন স্বামী চৌধুরী সাহেব। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মরিয়ম বেগম সব ঝড়ঝঞ্ঝা নীরবে হজম করে যেতেন। এখন সব সহ্যগুণ নষ্ট হয়ে গেছে, একটু চিন্তা-ভাবনাতেই মুষড়ে পড়েন। দু'চোখ বেয়ে শুধু অশ্রুবন্যা ঝরে, কিছুতেই বাধা মানে না।

জায়নামায থেকে উঠে দাঁড়াতেই পাশে এসে দাঁড়ায় মনিরা। ধীর শান্ত বসুমতির মতই এসে দাঁড়ায় সে শাশুড়ির পাশে। স্থির শান্তকণ্ঠে ডাকে—মামীমা!

মরিয়ম বেগম জায়নামাযখানা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে আঁচলে চোখ মুছে ফিরে তাকান পুত্রবধুর মুখের দিকে—বলো?

মনিরা একখানা চিঠি শাশুড়ির দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—নূরের চিঠি!

মরিয়ম বেগম চিঠিখানা হাতে নিয়ে বলেন—কি লিখেছে সে?

দেশে ফিরবে তাই জানিয়েছে।

আনন্দ উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠেন মরিয়ম বেগম—নূর দেশে ফিরবে? কবে, কতদিন পর বৌমা?

আগামী মাসে!

সত্যি, সত্যি নূর আগামী মাসে বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসছে? হে খোদা, তুমি আমার দাদুকে হেফাযতে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

চৌধুরীবাড়িতে আনন্দ উৎসব বয়ে চললো। যদিও মরিয়ম বেগম আর মনিরার মনে শান্তি ছিলো না, তবু বাড়ির সবাই মেতে উঠলো খুশিতে। তাদের ছোট বাবু আসছে—এটা কম আনন্দের কথা নয়।

মরিয়ম বেগম আর মনিরার মনেও যে আনন্দ হচ্ছে না তা নয়, তবু একটা গভীর খোঁচা সমস্ত হৃদয়কে জর্জরিত করে তুলছিলো, সে ব্যথা দীর্ঘসময় মাতা পুত্রের সন্ধান জানেন না, স্ত্রী জানে না তার স্বামী কোথায় কেমন আছে—যদি সে জীবিত থাকতো তাহলে কি আসতো না একটিবারের

জন্য। এরকম নানা প্রশ্ন সদা-সর্বদা মরিয়ম বেগম আর মনিরাকে উদ্বিগ্ন রেখেছিলো। এমন দিনে সংবাদ এলো নূর দেশে ফিরে আসছে।

সরকার সাহেব সমস্ত বাড়িটাকে মাতিয়ে তুললেন। ছোট বাবু আসছে কম আনন্দের কথা নয়। মনিরকে তারা ছোট সাহেব বলে সম্বোধন করতেন, সেই ছোট সাহেবের সন্তান নূর আজ ছোট বাবু।

কবে আসবে সেইদিনটা যেদিনটার জন্য প্রতীক্ষা করছে সবাই।

সরকার সাহেব গোটা বাড়িটাকে চুনকাম করে ধবধবে সাদা করে ফেললেন। রঙের আবলুস্ মাখিয়ে ঝক্ ঝকে তক্তকে করলেন আসবাবপত্রগুলো। গোটা বাড়িটাকে নতুন সাজে সাজানো হলো।

চৌধুরীবাড়ির ছেলে নূর ফিরে আসছে ডিটেকটিভ মিঃ জামান হিসেবে, আজ সে দক্ষ গোয়েন্দা।

শুধু চৌধুরীবাড়িতেই আনন্দের সাড়া পড়লো না, সমস্ত কান্দাই শহরে আলোড়ন জাগলো মিঃ জামান গোয়েন্দা প্রধান হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছেন।

পুলিশমহলও তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পুলিশমহলেও সাড়া পড়ে গেছে তরুণ ডিটেকটিভ মিঃ জামান চৌধুরীকে নিয়ে। বিদেশ থেকে গোয়েন্দাবিভাগে উচ্চ ডিগ্রিলাভ করেই সে আসছে। সবার মুখে একই কথা, এত কম বয়সে মিঃ জামান এতবড় ডিগ্রিলাভ করতে সক্ষম হয়েছেন, এ যেন সবার কাছে বিস্ময়। সবার মনে সীমাহীন আনন্দ।

ঐ দিনটার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে কান্দাইবাসী।

মরিয়ম বেগমের মনে পুত্রচিন্তা সব আনন্দকে মুষড়ে দিচ্ছে কেন সে এতদিন একটিবারের জন্যও এলো না, তবে কি তার কোনো বিপদ ঘটেছে?

কান্দাই শহরে মরিয়ম বেগম আর মনিরা যার চিন্তায় অস্থির সেই ব্যক্তি স্বয়ং দস্যু বনহুর তখন পৃথিবীর বুক ছেড়ে অনেক দূরে সৌরজগতে।

মৃত্যুর জন্য প্রহর গুণছে বনহুর আর দিপালী।

যে পোশাক তারা ঐ যানের মধ্যে পেয়েছে তা পরে যান থেকে বাইরে বের হবার জন্য চেষ্টা করেছিলো বনহুর কিন্তু তা পারেনি, কারণ পোশাকের মুখোশে অক্সিজেন ভরা ছিলো না। এমন অবস্থায় মৃত্যু যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে তাতে কোনো ভুল নেই।

এদিকে খাবার ফুরিয়ে এসেছে, যানে যে ফলমূল ছিলো তাও প্রায় শেষ, এমন অবস্থায় কি করবে তারা ভেবে পাচ্ছে না। ফ্লাক্সের পানিও ফুরিয়ে গেছে অনেকদিন। এখন তারা বাধ্য হয়ে স্নানাগারের পানি পান করছে,

নাহলে বাঁচবেই বা কি করে। ভাগ্যিস যানটার মধ্যে বাথরুম বা স্নানাগার ছিলো, তাই রক্ষা।

বনহুর নানাভাবে চেষ্টা করছিলো যদি কোনোক্রমে যানটাকে নিচে নামিয়ে আনা যায় তাহলে বাঁচার আশা তারা করতে পারতো।

নানান উপায়ে বনহুর হাতড়িয়ে চলেছে নিচে নামবার কোনো যন্ত্র আছে কিনা।

সব সময় বনহুর যানের মধ্যে এই নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। যানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে একাধারে নাড়াচাড়া করে চলেছে সে। তার মাথার মধ্যে একটা চিন্তাই ঘুরপাক করছিলো যা তাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। যানটা যখন উপরে উঠবার ক্ষমতা আছে তখন নিশ্চয়ই নিচে নামবারও ক্ষমতা আছে। তাই ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখছে বনহুর।

দিপালী এসে বসলো তার পাশে হাঁটু গেড়ে শান্ত গলায় বললো—রাজকুমার, এমনিভাবেই কি দিনরাত মেসিনপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন?

এ ছাড়া কি করবার আছে দিপালী? আমি এসব পরীক্ষা করে দেখছি যদি বাঁচার কোনো সুযোগ খুঁজে পাই।

- রাজকুমার!

বলো দিপালী? স্থির দৃষ্টি তুলে তাকালো বনহুর দিপালীর মুখের দিকে।

দিপালীর দু'চোখ ছলছল করছে, শান্ত স্নিগ্ধ তার মুখমণ্ডল কিছু বলতে গিয়ে ঠোঁট দু'খানা কেঁপে গেলো তার।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, ডান হাতখানা দিপালীর কাঁধে রেখে বললো—জানি তুমি কি বলতে চাচ্ছো। সত্যি এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে, একথা আমিও ভাবতে পারিনি।

দিপালী হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে বললো—রাজকুমার, আমাকে রক্ষা করতে গিয়েই আপনি এ বিপদ মাথা পেতে নিয়েছেন। মহাশূন্যে এই অদ্ভুত যানটার মধ্যে একদিন আমাদের প্রাণহীন দেহ শুষ্ক পঞ্জের মত ভাসবে......

হাঁ, এ কথা তুমি সত্য বলেছো দিপালী। আর সে অবস্থা আসতে বেশি দেরীও নেই, কারণ যানে যা ফলমূল আর পানীয় ছিলো সব শেষ হয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে সে—এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে।

দিপালী বললো—ক্যারিলং-এর মতই হবে আমাদের শেষ পরিণতি?

হাঁ, ক্যারিলং-এর প্রাণহীন দেহ যুগ যুগ ধরে ভাসবে সৌরজগতের নিস্তব্ধতায়, তেমনি এই অদ্ভুত যানটার মধ্যেও আমরা দু'জন মমি হয়ে থাকবো।

রাজকুমার!

কেন ভয় পাচ্ছো দিপালী, মরতে যখন একদিন হবেই তাতে এত ভয় কেন?

এভাবে মরতে হবে, আমি ভাবতে পারিনি।

এই পৃথিবীতে কত কোটি কোটি মানুষ কে কিভাবে মরবে বা কাকে মরতে হবে কেউ জানে না। মৃত্যু এমন একটা জিনিস যা সবার অজ্ঞাতে রয়েছে। এই ধরোনা ক্যারিলং কি ভেবেছিলো তাকে পৃথিবী ছেড়ে হাজার হাজার কোটি কোটি মাইল উপরে মহাশূন্যে সৌরজগতে ভাসমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে?

দিপালী স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলো ঐ মুখটার দিকে। যে মুখে নেই কোনো ভয়-ভীতির ছাপ।

কি দেখছো অমন করে?

রাজকুমার, আপনার পাশে মরতে পারবো এই আনন্দ......

আনন্দ!

হাঁ আনন্দ!

বলো কি দিপালী?

মৃত্যুভয়ে আমিও ভীতু নই রাজকুমার কিন্তু......

বলো থামলে কেন? বনহুর দিপালীর পাশের আসনটায় বসে পড়লো, তার চোখে মুখেও একটা গম্ভীর ভাব ফুটে উঠেছে।

দিপালী বললো—কি চেয়েছিলাম আর কি পেলাম......

বলো বলো? থামলে কেন বলো?

যা চেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি পেয়েছি।

তার মানে?

রাজকুমার, আপনার সান্নিধ্য আমার জীবনে পবিত্রতার পরশ এনে দিয়েছে। আমি যে পথে এগিয়ে যাচ্ছিলাম সে পথ ঘৃণ্য জঘন্য নরকসম......আমি সেই পথ পরিহার করার প্রেরণা পেয়েছি আপনার মধ্যে।

দিপালী!

হাঁ রাজকুমার।

একটা দুর্ধর্ষ ডাকুর সান্নিধ্যে এসে তুমি......

আপনি দুর্ধর্ষ ডাকু হতে পারেন কিন্তু আপনার চরিত্রের কাছে সব পুরুষকেই হার মানতে হবে। আপনি মানুষ নন দেবতা...দিপালী নতজানু হয়ে বনহুরের পা দু'খানা স্পর্শ করলো।

বনহুর ওকে তুলে ধরলো—একি করছো দিপালী!

আপনার পবিত্র পরশে আমি সোনার মত খাঁটি হয়ে গেছি। আমার মরতে আর ভয় নেই রাজকুমার।

দিপালী, মানুষ বলে নারীজাতি ছলনাময়ী কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। নারী ছলনাময়ী নয়, পুরুষরা তাদের যেভাবে নাচায় সেইভাবে তারা নাচে। যেভাবে তাদের নিয়ে খেলা করে সেইভাবে তারা খেলে। নারীজাতির সরলতার সুযোগ নিয়ে তারা তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে পুতুল বানিয়ে নাচায়। আমি জানি নারী শুধু পুরুষের খেলার সামগ্রী বা নাচের পুতুল নয় তারা, মায়ের জাত......স্নেহ ভালবাসা প্রেম প্রীতি যা আমরা দেখতে চাই তা শুধু ঐ নারীজাতের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ আছে। দিপালী জীবনে বহু নারীর সান্নিধ্যে আমাকে আসতে হয়েছে, আমি তাদের এক একজনের মধ্যে এক এক রূপ দেখেছি......থামলো বনহুর।

দিপালী অবাক হয়ে শুনছে, অপলক চোখে সে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখমণ্ডলের দিকে। একটা ভাবের উন্মেষ তাকে আত্মহারা করে তুলেছে।

বলছে বনহুর—নারীকে আমি যতই দেখেছি ততই বিস্মিত হয়েছি, যদিও এক এক নারীর মধ্যে আমি এক এক পৃথক রূপ লক্ষ্য করেছি কিন্তু সব শেষ রূপ হলো তারা মায়ের জাত। যত ঘৃণ্য জঘন্যমনাই হোকনা কেন, তবু তাদের মধ্যে আছে এক অদ্ভুত মাতৃশক্তি......যে শক্তির কাছে পুরুষ জাতির পরাজয়।

রাজকুমার।

হাঁ দিপালী, আমি নিজকে দিয়েই বিচার করেছি। ইচ্ছা করলে আমি যে সব নারীকে সান্নিধ্যে পেয়েছি তাদের প্রতি অবিচার করতে পারতাম। আমার পাপ বাসনাকে আমি করতে পারতাম পরিতার্থ। কোন শক্তিই আমাকে বাধা দিতে পারতো না আমার পাপ বাসনা থেকে কিন্তু আমি তা হতে দেইনি—দেবোনা কোনোদিন। আমার প্রতিটি ইন্দ্র আমার চরিত্রের কাছে আবদ্ধ। আমি বলগাহীন অশ্বের মত আমার ইন্দ্রগুলোকে ছেড়ে দিতে পারি না। পুরুষের কাছে নারীজাতি অসহায় বলা যায়—যদিও নারীজাতি এ কথা মেনে নিতে চায় না।

এবার দিপালী কথা বললো—হাঁ, একথা অনেক নারীর মুখেই আমি শুনেছি, একদিন আমিও বলতাম! নারীজাতি কেন অসহায় হবে! তাদের কি মন নেই, তাদের কি হৃদয় নেই—তারা কি দৈহিক শক্তি থেকে বঞ্চিত? আজ আমি বুঝি সবই আছে তবু তারা দুর্বল।

কারণ স্নেহ মায়া মমতা প্রেম ভালবাসা নারীর হৃদয়কে করে রেখেছে কোমল। যত কঠিন আর শক্তিশালীই হতে চাক না কেন, তারা পারবে না। পুরুষের কঠিন হৃদয়ের কাছে, দৈহিক নির্মম পাশবিক শক্তির কাছে হবে

তাদের পরাজয়। পরাজয় ঠিক বলতে পারি না, একদিক দিয়ে বলতে গেলে এটাই নারীজাতির জীবনের সার্থকতা নিস্পেষণ......যেমন কঠিন পাথরের আঘাতে সুন্দর পুষ্পের অবস্থা হয় ঠিক তেমনি। এতে পুষ্পের পরাজয় হয় না, হয় তার জীবনের সার্থকতা। দিপালী, লজ্জা নারীর ভূষণ, তুমি যাই হও বা যাই ছিলে কিন্তু তুমি যে একজন লজ্জাশীলা নারী তাতে কোনো ভুল নেই। আমি ভালবাসি লজ্জাশীলা নারী।

রাজকুমার......রাজকুমার, আমি একজন বাঈজী ছিলাম। লজ্জাহীনতাই ছিলো আমার.........

না না দিপালী, তুমি বাঈজী ছিলে না, তোমাকে বাঈজী করা হয়েছিলো। তুমি যদি সংসারে বাবা-মার স্নেহের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে, তাহলে কি আজ নিজকে বাঈজী ভাবতে পারতে? আজ তুমি সংসারী হতে, স্বামী সংসার সন্তানদের নিয়ে সভ্যসমাজে মা বোন স্ত্রী বলে পরিচিতা হতে। যে সুযোগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে এর জন্য দায়ী পুরুষ, যারা তোমাকে বাঈজী বানিয়ে শুধু ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলো। দিপালী, তুমি ফুলের মতই পবিত্র.........

না না রাজকুমার। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো দিপালী।

বনহুর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—দেহ আর মন আলাদা জিনিস। তোমার দেহ নিয়ে মানুষ ছিনিমিনি খেলেছে। কিন্তু তোমার মন...মন তো কেউ নিতে পারেনি দিপালী। দেহের ক্ষয় আছে কিন্তু মনের বা আত্মার ক্ষয় নেই। তোমার মন যা চায়নি, তোমার আত্মা যা মেনে নিতে পারেনি সেটাই তো সত্য। তোমার আত্মার কাছে তুমি চিরসুন্দর পবিত্র.........

রাজকুমার!

হাঁ দিপালী। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ফিরে তাকাতেই হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো যানটার বাইরে সৌরজগতে।

দেখলো বনহুর, একটা বিস্ময়কর দ্রব্য ভেসে আসছে তাদের যানটার দিকে। বনহুর দিপালীকে লক্ষ্য করে বললো—দেখো দেখো, ঐ দেখো ওটা কি?

দিপালীও অবাক চোখে তাকালো সেইদিকে।

বিস্ময়কর একটা বস্তু এগুচ্ছে তাদের যানটার দিকে।

বনহুর বললো—ওটা মেঘ নয়।

তবে কি হতে পারে? বললো দিপালী।

বনহুর বললো—আমার মনে হয় ওটাও আমাদের যানের মত একটা যান।

সত্যি?

মনে হচ্ছে তাই।

ওর মধ্যেও কি মানুষ আছে?

ঠিক বলতে পারছি না, থাকতেও পারে।

কি আশ্চর্য।

হাঁ দিপালী, আশ্চর্যই বটে। এবার হয় মৃত্যু ঘটবে, নয় বাঁচার আশ্বাস পাবো।

রাজকুমার! দিপালী বনহুরের বুকে মাথা রাখলো।

বনহুর ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বসিয়ে দিলো পাশের আসনে এবং নিজে ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে ভাসমান বস্তুটিকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো।

সেই বস্তুটি যতই নিকটে আসতে ছিল ততই অবাক হচ্ছে বনহুর আর দিপালী। বস্তুটা ছোট্ট নয়, বিরাট একখণ্ড মেঘের মত দেখতে।

যানটার মধ্য হতে একটা নীলাভ আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে।

অতি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেই অদ্ভুত মেঘখণ্ডের মত যানটা।

বনহুর আর দিপালী প্রতীক্ষা করছে।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মানুষের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থায় উপনীত হয়েছে দিপালী। যে বস্তুটা এগিয়ে আসছে সে যে মেঘ নয় তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

দিপালী ভীতকণ্ঠে বললো—জানিসনা ঐ বস্তুটা কি, কেনই বা আমাদের যানটার দিকে এগুচ্ছে।

বনহুর বললো—হয় মরতে হবে না হয় বাঁচার কোনো আশ্বাস পাবো.........একটু থেমে বললো বনহুর—এই ভাসমান যানটার মধ্যে তিল তিল করে শুকিয়ে মরার চেয়ে একটা বিস্ময়কর মৃত্যু বেছে নেবো, তাতে ভাববার কি আছে।

দেখুন ভাসমান বস্তুটা কত কাছে এসে পড়েছে।

হাঁ, তাই তো দেখছি। বনহুর ছোরাখানা তুলে নিলো হাতে

মেঘের আকারের যানটা একেবারে কাছাকাছি এসে পড়লো। যানটার ভিতর থেকে একটা আলোর জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ছে।

মেঘের আকার যানটা কিছুদুরে ভাসমান অবস্থায় থেমে গেলো আচম্বিতে।

অবাক হয়ে গেলো বনহুর আর দিপালী।

মেঘের আকার ভাসমান অদ্ভুত বস্তুটার মধ্য হতে বেরিয়ে এলো একটা তীব্র আলোকরশ্মি। চোখ ধাঁধিয়ে গেলো দিপালী আর বনহুরের।

বনহুর তাড়াতাড়ি দিপালীকে মেঝেতে শুয়ে যেতে বললো। নিজেও সে শুয়ে পড়লো যানটার মেঝেতে।

যানটার মেঝেতে শুয়ে পড়লো ওরা দু'জন।

কিন্তু একি, সেই তীব্র অদ্ভুত আলোকরশ্মি বনহুর আর দিপালী সহ অদ্ভুত যানটাকে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভাসমান নৌকার মত তাদের যানটা এগিয়ে যাচ্ছে সাঁ সাঁ করে ঐ মেঘের আকার যানটার দিকে।

দুলছে দিপালী আর বনহুরের দেহ।

দিপালীর মুখমন্ডল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

বুঝতে পারছে বনহুর। সে হাত বাড়িয়ে দিপালীর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো—ভয় নেই দিপালী, যা ভাগ্যে আছে তাই ঘটবে।

যানটা এসে গেছে প্রায় কাছাকাছি।

বনহুর আর দিপালীর বুক টিপ্ টিপ্ করছে। কিছু পরে তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে কে জানে।

তবে বনহুরের মনে নতুন উন্মাদনা, যা ঘটবে তা ঘটবেই তবু তো সে নতুন এক আবিস্কারে সক্ষম হলো। কিন্তু সে আবিস্কার পৃথিবীর মানুষকে হয়তো দেখাতে পারবে না বা জানাতে পারবে না। তাতে কি এসে যায়, সে নিজেই তো জানতে চায় সৌরজগতের রহস্য।

একটুখানি ধাক্কা খেয়ে যানটা থেমে গেলো।

বনহুর আর দিপালী লক্ষ্য করলো সেই তীব্র রশ্মির ছটা আর নেই।

ওরা দু'জন উঠে দাঁড়াবে কিনা ভাবছে ঠিক সেই মুহূর্তে যানটার সম্মুখভাগের কিছু অংশ খুলে গেলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড শুধু, বনহুর আর দিপালী একটুখানিমাত্র দেখলো যে, একজন অদ্ভুত পোশাকপরা মানুষ তাদের যানটার মধ্যে প্রবেশ করলো — — —তারপর আর কিছুই মনে নেই, কারণ ওরা দু'জন অক্সিজেনের অভাবে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো।

প্রথমে সংজ্ঞা ফিরে এলো দিপালীর। সে চোখ মেলতেই অবাক হলো। ভাবলো সে মরে গেছে এটা মৃত্যুর পরের জগৎ। ভালভাবে তাকিয়ে দেখলো এখন সে কোথায়। একটা শুভ্র নরম কোনো বস্তুর উপর শুয়ে আছে সে, তার চারপাশে কোনো আবরণ নেই। শুধু চাপ চাপ বরফ, তবে সত্য বরফ কিনা তা সে তখনও জানে না।

দিপালী উঠে বসলো।

উঠে বসেই দিপালী বেশ অনুভব করলো যার উপরে সে এতক্ষণ শায়িত ছিলো তা কোনো তুলো বা ঐ জাতীয় জিনিস নয়, বরফের কুচি। তবে এতক্ষণ তার জমে যাবার কথা ছিলো, কারণ বরফের কুচি ভীষণ ঠান্ডা তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু মোটেই দিপালী ঠান্ডা অনুভব করছে না। তাহলে কি সে সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছে। এখন তার আত্মা এ সব অনুভব করছে নিশ্চয়ই। তাই হবে, নাহলে এতক্ষণ সেও বরফে পরিণত হতো।

তাকালো দিপালী আশেপাশে তার রাজকুমারের সন্ধানে। ধীরে ধীরে সব মনে পড়ছে, তারা পৃথিবীর বুক ছেড়ে কোটি কোটি মাইল উপরে উঠে কোনো এক অদ্ভুত যানের মধ্যে আটকা ছিলো। রাজকুমার ছিলো তার পাশে। তারপর এক সময় একখণ্ড মেঘের মত অদ্ভুত ধরনের বিস্ময়কর কোনো এক বস্তু! মেঘের মই ভেসে ভেসে আসছিলো, তারপর হঠাৎ থেমে পড়লো। সেকি এক তীব্র আলোর ছটা, চোখ ধাঁধিয়ে গেলো মুহূর্তে। শুয়ে পড়লো ওরা দু'জন যানটার মেঝের মধ্যে.........তারপর যানটা সেই তীব্র আলোকরশ্মির টানে এগিয়ে যেতে শুরু করলো। হঠাৎ থেমে গেলো যানটা, তারপর তাকিয়ে দেখলো অদ্ভুত যা কোনোদিন দেখেনি দিপালী সেই ধরনের পোশাকপরা একটা লোক তাদের যানের মধ্যে প্রবেশ করলো, তারপর আর মনে নেই কিছু।

দিপালী কতক্ষণ পর হুশ ফিরে পেলো তাও সে জানে না। চারিদিকে তাকিয়ে রাজকুমারের সন্ধান করতে গিয়ে শুধু দেখলো সাদা আর সাদা—সবকিছুই সাদা ধবধবে। দিপালী নিজের পরিধেয় বস্ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলো তার সমস্ত বস্ত্র এবং দেহে শুধু সাদা বরফের গুড়ো কুচি।

নিজকে জীবিত না মৃত পরীক্ষা করে দেখবার জন্য দিপালী নিজের হাতের পিঠে কামড়ে দেখলো—না, সে মরে যায়নি—জীবিতই আছে। তাহলে রাজকুমার গেলো কোথায়? তাদের সেই বিস্ময়কর যানটাই বা গেল কোথায়? কিন্তু কে দেবে তার জবাব, চারিপাশে শুধু নির্জনতা আর নীরবতা—কোনো শব্দই তার কানে ভেসে আসছে না।

এটা তাহলে কোন্ দেশ?

সৌরজগৎ না মাটির পৃথিবী?

না, মাটির পৃথিবী এমন হতেই পারে না, এটা নতুন একদেশ যে দেশ কেউ কোনোদিন দেখেনি। চারিদিকে গুড়ো গুড়ো সাদা ধুয়ার মত কি যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। এমন কি দিপালীর দেহেও এসে লাগছে সেই অদ্ভুত পদার্থগুলোর হাল্কা পরশ।

ভারী মিষ্টি ছোয়া পদার্থগুলোর।

❑

না, আর আমি নাচতে পারবো না। রাজপথে নেচে নেচে তোদের পয়সা এনে দেবো আর তোরা সেই পয়সা দিয়ে মদ খাবি আর সুযোগ পেলেই মানুষকে হত্যা করে তাদের সব লুটে নিবি? কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে থামলো ফুল্লরা।

রূপ-যৌবনে ঢল ঢল করছে ওর দেহ। যেন একটা ফুটন্ত গোলাপ কুঁড়ি। ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো মালোয়া—ফুল্লরা, আমি তোকে চুরি করে এনেছি শুধু আমার জন্য। তুই নাচবি গাইবি, তোর চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে সাদা সাদা টাকা। আমার সে আশা পূর্ণ হয়েছে। আজ টাকা আর টাকা—চারপাশে আমার টাকার স্তূপ........

তবু কেন তুই আমাকে পথে পথে নাচতে নিয়ে যাস্ বল্ বল্ মালোয়া?

পয়সা এমন একটা জিনিস্ যার শেষ নেই। যার যতই থাকনা কেন, আরও চাই।

কিন্তু আমি আর নাচবো না।

নাচবিনা?

না।

তাহলে.........দেয়াল থেকে শংকর মাছের লেজের চাবুকখানা হাতে খুলে নেয় মালোয়া।

ফুল্লরা বলে উঠলো—মেরে ফেল্ তবু নাচবো না। একটু থেমে বললো—এতদিন যা বলেছিস্ শুনেছি কিন্তু আর না।

মিথ্যে কথা, তোর নাম পাল্টে রাখলাম তুই সে নাম বাতিল করে দিলি। তোর আসল নামেই ডাকতে হচ্ছে—জানিস্ এ নামে আমাদের কত?

ভয়...আমার নামে তোদের ভয় কেন?

ফুল্লরা নাম শুনলে তোদের আস্তানার সবাই তোকে চিনে ফেলবে, তখন আমরা বিপদে পড়ে যাবো। তাই তোকে আমাদের আড্ডাখানার বাইরে নাম ধরে ডাকি না। হাঁ, আরও একটা কথা তুই আমাদের রাখিস্নি, সে হলো তোর ঐ নীলমনি হার যা এখনও তুই গলায় পরে আছিস। ঐ হারছড়াই আমাদের মৃত্যুর কারণ হবে না, এটাই বা কে জানে। তুই বলছিস্ আমাদের সব কথা মেনে নিয়েছিস কিন্তু তা নয়, তুই আমাদের কোনো কথাই মেনে নিস্নি।

তাহলে নাচছি কেন?

মনের আনন্দে আর.........হাতের চাবুকখানা দেখিয়ে বলে মালোয়া—এটার গুণে!

না, মেরে ফেললেও আর নাচবো না।

যদি খেতে না দিয়ে শুকিয়ে মারি?

তবুও না।

এটাকেও ভয় করিস্ না?

অনেক তো মেরেছিস্। আমার দেহের চামড়ায় তোর ঐ চাবুকের দাগ কেটে বসে আছে। আমি তবু মরিনি, বেঁচে আছি... ... ...

জানিস্ ফুল্লরা, আমি তোকে কত ভালবাসি!

ও কথা বলে কোনো ফল হবে না।

কিন্তু তোকে যে আমার চাই।

মালোয়া, তুই আমার বাপুর বয়সী, আমি তোর মেয়ের মত, আর তুই কিনা বলছিস্... ... ...

যদি সত্যি আমার হাত থেকে বাঁচতে চাস্ তাহলে তোকে নাচতেই হবে, নেচেই আমাকে খুশি করতে হবে আর এনে দিতে হবে পয়সা।

ফুল্লরার মুখখানা ম্লান হয়ে গেলো, সে ছলছল চোখে দুটো তুলে তাকালো মালোয়ার দিকে। ফুল্লরা শংকর মাছের লেজের চাবুকখানাকে ভয় করে না। সে না খেয়েও থাকতে পারবে, এমন কি মৃত্যুকেও ভয় করে না ফুল্লরা, শুধু তার ভয় নিজের ইজ্জৎ—ইজ্জতের উপর কোনো হামলা না আসে। ইজ্জৎ রক্ষা করতে গিয়ে ফুল্লরা নাচে, নাচতে হয় তাকে পথে পথে।

ফুল্লরা, তোর জন্য সর্দার নরসিংকে হত্যা করেছি। হত্যা করেছি দলের আরও অনেকগুলোকে। যে তোর দিকে নজর দিয়েছে তাকেই হত্যা করেছি... ... ...তারপর তোকে নিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি দল ছেড়ে দূরদেশে —অনেক দূরদেশে। এ দেশে কেউ তোর আর আমার খোঁজ পাবে না।

ফুল্লরা ওড়নার আঁচলে চোখ মুছে পা বাড়ায়—চল্ কোথায় যেতে হবে।

মালোয়া বাদ্যযন্ত্রটি কাঁধে তুলে নিয়ে ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে বলে—চল্।

এ দেশ কান্দাই ছেড়ে বহু দূরে।

নীল নদের ওপারে।

মালোয়া এখন এই নতুন দেশে ফুল্লরা সহ বাসিন্দা হয়েছে। এখানে তার কোনো দল নেই; শুধু মালোয়া আর ফুল্লরা। ফুল্লরাকে কেউ যদি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় সেই ভয়ে সে ওকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সর্দারকে হত্যা করেছে কৌশলে। হত্যা করেছে মালোয়া দলের আরও অনেককে। দলের যার উপরে তার সন্দেহ এসেছে, ফুল্লরাকে পেতে চায় বা

ভালবাসতে চায় অথবা তার সান্নিধ্যে আসতে চায় তাকেই সে হত্যা করেছে নানাভাবে।

তবু সে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

সর্বদা একটা ভয় তাকে বিহ্বল করে তুলেছে না জানি কখন সে ফুল্লরাকে হারাবে। শুধু ফুল্লরাই নয়, ফুল্লরাকে হারালে তার সঙ্গে হারাবে মালোয়া নীলমণি হার।

তাই মালোয়া ফুল্লরাকে নিয়ে দল ত্যাগ করে দূরে পালিয়ে এসেছে।

ফুল্লরা নাচে গায়।

মালোয়া বাদ্যযন্ত্র বাজায়।

অনেক অনেক পয়সা আসে, মালোয়ার কোনো অভাব নেই। প্রচুর অর্থের মালিক এখন মালোয়া।

ফুল্লরা যা চায় না বা সে ভালবাসে না তা সে করে না। কারণ ফুল্লরাকে বিগড়ালে সব তার মাটি হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে তার সব প্রচেষ্টা।

ফুল্লরা যখন ঘুমায় তখন লালসাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে মালোয়া কিন্তু তার কেশগুচ্ছ সম্পর্শ করার সাহস সে পায় না। মালোয়া জানে ফুল্লরা মানবী নয়, নাগিনী। বিষধর সর্পিনীর মতই ফুল্লরার রাগ।

একদিন মালোয়া ঠাট্টা করে ফুল্লরাকে টেনে নিয়েছিলো কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে ফুল্লরা এমনভাবে মালোয়ার হাত কামড়ে দিয়েছিলো যে, এত রক্তপাত হয়েছিলো যার জন্য আজও সে ঐ হাতে তেমন শক্তি পায় না।

এরপর থেকে মালোয়া সাহসই পায় না ফুল্লরাকে কিছু বলতে। সারাটি দিন ওকে নাচিয়ে পয়সা কামায় মালোয়া। মায়ের ব্যথায় মাঝে মাঝে নাচতে না পারলে মালোয়া ওর পায়ে ওষুধ লাগাতে যায়, কিন্তু কেড়ে নিয়ে মালিশ করতে করতে বলে—যা ভাগ, এত দরদ দেখাতে হবে না।

মালোয়া আর কিছু বলতে পারেনি সেদিন।

এমনিভাবে দিনগুলো কাটছিলো ফুল্লরার। অনেকদিন পালাতে চেষ্টা করেছে কিন্তু ঐ শয়তানটার চোখ এড়িয়ে পালাতে সক্ষম হয়নি ফুল্লরা, যখন পালাতে চেষ্টা করেছে তখনই ধরা পড়ে গেছে। আর পালিয়ে যাবেই বা কোথায়। বয়স তো তার বেশি নয়, অচেনা অজানা জায়গায় সে নিজকে বড় অসহায় মনে করে। এখানে মালোয়াকে তার আপনজন বলে মনে হয়, যদিও সে তার চরম শত্রু।

মাঝে মাঝে ফুল্লরা ভাবে আস্তানার কথা। মায়ের মুখখানা মনে পড়ে, মনে পড়ে সবার কথা। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে জাভেদকে। তার খেলার সাথী জাভেদ। না জানি সে কেমন আছে, এখন কত বড় হয়েছে। কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবতে পারে না, একটা শক্তিশালী বলিষ্ঠ মুখ ভেসে উঠে চোখের

সামনে—সর্দারের মুখ, যার অসীম স্নেহ আর আদরে সে এত বড় হয়েছিলো! যার আদরভরা কণ্ঠ স্বর এখনও তার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হয়, সেই সর্দার বনহুর। তার দান এখনও যে গলায় রয়েছে নীল মনিহার।

ফুল্লরার দুই গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

হঠাৎ সেই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলো মালোয়া। ফুল্লরার চোখে পানি দেখে বলেছিলো—কি রে, কাঁদছিস কেন?

ফুল্লরা কোনো জবাব দিতে পারেনি সেদিন। কেমন করে বলবে সে ভাবছে আস্তানায় যারা আছে তাদের কথা। ভাবছে সর্দারের কথা, তাদের আশ্রয়দাতা বনহুরের কথা।

ফুল্লরা এমনি করে দিনের পর দিন ভেবে চলে, পায় না কোনো পথ খুঁজে।

এখানে শুধু একা আর একা, দল আর নেই। তবু মালোয়া মাঝে মাঝে দল করে নেয়—কিছু মাতাল বদমাইস লোক মালোয়ার সাথী। তাদের নিয়ে নেশা পান করে আর আড্ডা মারে, ফুল্লরাকে চাবুক মেরে নাচায়।

এসব অসহ্য ফুল্লরার তবুও সহ্য করতে হয়। কত দিন কত নিরীহ মানুষকে ধরে এনে তার সব কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করে। এগুলো মালোয়ার নিত্যকার কাজ।

ফুল্লরা সব দেখে, মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করে কিন্তু কোনো ফল হয় না বরং তাকে সহ্য করতে হয় চাবুকের আঘাত।

❑

দিপালী উঠে দাঁড়ালো কিন্তু একি, তার দেহটা এত হাল্‌কা মনে হচ্ছে কেন। পা যেন মাটি স্পর্শ করতে চাইছে না, শূন্যে হাঁটছে যেন সে। কি সুন্দর হাল্‌কাভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সে, ঠিক স্বপ্নের মত লাগছে তার কাছে। মাথার উপরে ঝরে পড়েছে ফুর ফুর করে বরফের কুচিগুলো ফুলের রেণুর মত।

কিছুদুর এগুতেই দিপালীর কানে গেলো অদ্ভুত ধরনের এক কণ্ঠস্বর। এটা নারীকণ্ঠ তাতে কোনো ভুল নেই। তবে এত সুন্দর কণ্ঠস্বর এর পূর্বে আর শোনেনি দিপালী।

একটুখানি এগিয়ে কান পাতলো দিপালী কিন্তু সেই নারীকণ্ঠের এক বর্ণও সে বুঝতে পারলো না। কণ্ঠস্বর যেন কোনো বাদ্যযন্ত্রের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে। কে বা কারা কিই বা বলছে তারা। তার রাজকুমারই বা কোথায়?

হাঁটতে বড় ভাল লাগে দিপালীর।

শরীরটা বয়ে নিতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। যেদিকে পা বাড়াচ্ছে সেইদিকে এগিয়ে যাচ্ছে শরীরটা অতি সহজেই।

ভাবছে দিপালী, এখন তার মৃত্যু হয়েছে। এটা মরণের পরের জগৎ। আঃ কি সুন্দর আরামদায়ক জায়গা, চিরদিন এখানে যদি সে থাকতে পারতো তাহলে কি জমাটাই না হতো। এখানে তার নিঃশ্বাস নিতে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। বরং নিঃশ্বাস নিতে বেশ ভাল লাগছে, স্বচ্ছ লাগছে বুকটা।

দিপালী প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর এগুচ্ছে। ক্ষুধা-পিপাসা যেন ঠিক অনুভব করতে পারছে না।

সেই মিষ্টিমধুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে তার কানে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে দিপালী কিন্তু কোথাও কোনো কিছু বা কেউ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। তবে কোথা থেকে শব্দটা আসছে, মনে হচ্ছে যেন কোনো স্বপ্নপুরী থেকে এ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

কোথায়, কতদূরে সে স্বপ্নপুরী কে জানে।

দিপালী এগুচ্ছে।

সহসা দূরে অনেক দূরে সামনে তাকাতেই দেখতে পেলো মেঘের মত ধবধবে সাদা এক রাজপুরী। ঠিক স্বপ্নপুরীর মতই লাগছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না, তাই নির্বিঘ্নে হাঁটছিলো দিপালী। অনেকটা এসেছে যে, যেখানে শুয়েছিলো ঐ জায়গাটা পড়ে রয়েছে অনেক পেছনে। দিপালীর চোখ দুটো আনন্দে চকচক করছে, নিশ্চয়ই ঐ স্বপ্নপুরীর মধ্যে আছে তার রাজকুমার। চাঁদের আলোতে স্বপ্নপুরী যেন ঝলমল করছে।

দিপালী ভালভাবে লক্ষ্য করছিলো, তবে কি এটা চাঁদের দেশ? আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পৃথিবীর মানুষ চাঁদের পিঠে অবতরণ করে চাঁদের দেশ থেকে পাথর এবং মাটি নিয়ে গেছে কিন্তু এখানে তো সে মাটি বা পাথর দেখতে পাচ্ছে না। কেমন যেন অদ্ভুত দেশ, দিপালী চাঁদকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। যদিও চাঁদের আলো ধূসর বর্ণ লাগছে এখানে।

যেখানে সে পথ চলছে এটা চাঁদ বা চাঁদের দেশ নয়। চাঁদের পিঠে মানুষ অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না, এটা জানে দিপালী। তবে এটা কোন্ দেশ......

হঠাৎ চমকে উঠলো দিপালী।

কেউ যেন তার কাঁধে হাত রাখলো, খুব হালকা হাতের পরশ।

ফিরে তাকাতেই বিস্ময়ে আড়ষ্ট হলো দিপালী, তার পিছনে একটা মনুষ্যমূর্তি। হাতে তার অদ্ভুত ধরনের একটা বস্তু। পোশাক কিসের তৈরি

তা দিপালী বুঝতে পারলো না। মনে হলো চাপ চাপ তুলো দিয়ে সেই পোশাক তৈরি করা হয়েছে।

দিপালীকে লক্ষ্য করে কিছু বললো লোকটা, কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা পুরুষ নয়—নারী। এবং সে যখন কথা বললো তখন তার কণ্ঠস্বর মনে হলো সেই সুরের ঝংকার , যা সে কিছুক্ষণ পূর্বে শুনতে পেয়েছিলো।

অল্পক্ষণ পর আরও একজন হাজির হলো সেখানে। দিপালীকে লক্ষ্য করে কি যেন বললো ওরা নিজেরা।

দিপালীর কানে মধুবর্ষণ করলো সেই কণ্ঠস্বর।

এতক্ষণে দিপালী বুঝতে পারলো এদের কথাবার্তাই সে এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিলো। ভারী মিষ্টি আর সুন্দর গলার আওয়াজ।

দিপালী অবাক হয়ে তাকালো ঐ অদ্ভুত নারী দু'টির মুখের দিকে। কোন সাজসজ্জার বালাই নেই অথচ কী অপূর্ব সুন্দরী।

দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না দিপালী।

মেয়ে দু'টি অপূর্ব সুরের ঝংকারে হেসে উঠলো। ওদের একজন কি যেন বললো।

দিপালী তার এক বর্ণও বুঝতে পারলো না।

মেয়ে দু'টি তার দু'পাশে দু'হাত ধরলো, যেন দু'টি ফুলের পরশ। দিপালীকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো ওরা হাল্‌কা মেঘের মত।

সেই ধূসর রাজপুরীটার নিকটে পৌঁছতে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না। আশ্চর্য অট্টালিকা, শুধু চাপ চাপ বরফের কুচি দিয়ে তৈরি সে যেন এক স্বপ্নপুরী।

গেটের সম্মুখে আসতেই দরজা খুলে গেলো।

ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখলো দিপালী, তাকে যে দু'জন অদ্ভুত নারী এগিয়ে নিয়ে এসেছে তাদের মত আরও দু'চার জন নারী শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রহরীর কাজে নিযুক্ত আছে।

তবে খুব বেশি লোকজন দেখতে পেলো না দিপালী। সব যেন কেমন নিঝুমপুরির মত মায়াময়।

দিপালীকে দেখে সবাই তারা অবাক হয়ে যায়।

ওরা তাকে আশ্চর্য হয়ে দেখছে আর নিজেরা কিছু বলাবলি করছে। একবর্ণও দিপালী বুঝতে পারছে না তাদের কথাগুলোর।

দিপালী হা করে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে।

ওরাও তাকিয়ে আছে দিপালীর দিকে। দিপালী কিছু বলবে, জিজ্ঞাসা করবে তার রাজকুমারের কথা কিন্তু ওরা তার কথার একটা অক্ষরও বুঝতে পারবে না জানে সে। তবু বললো দিপালী —বোন, আমার সঙ্গীটি কোথায়?

দিপালী নিজের কণ্ঠস্বর শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলো। ঐ নারীদের কণ্ঠস্বরের মতই লাগছে তার নিজের কণ্ঠস্বর। ভারি মিষ্টি আর সুন্দর লাগছে গলার আওয়াজ।

মেয়ে দু'টি কিন্তু তার কথা কিছু বুঝতে পারেনি তাই তারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো দিপালীর মুখের দিকে।

দিপালী বললো আবার—তোমরা আমার কথা কিছু বুঝতে পারছো না বুঝি?

ওরা হাসলো খিল খিল করে।

ওরা নিজেরা কিছু বলাবলি করলো, তারপর দিপালীর হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো।

দিপালী বাধা দিলো না, বরং ওদের সঙ্গে একত্রে পা মিলিয়ে এগিয়ে চললো।

যতই এগুচ্ছে ততই বিস্ময় বাড়ছে দিপালীর। শুধু নারী আর নারী—এ আবার কোন্ দেশ। এখানে কি কোনো পুরুষ নেই?

হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে দিপালীর। তাকে নিয়ে অদ্ভুত নারী দু'জন একটা অদ্ভুত কক্ষে প্রবেশ করলো। সেটাকে ঠিক কক্ষ বলা যায় না, চাপ চাপ বরফের কুচি দিয়ে তৈরি একটা জায়গা।

চাঁদের আলোতে ঝলমল করছে সব, ছাদ বলতে কিছু না থাকায় চাঁদের আলো প্রবেশে বাধা নেই কোনো জায়গার। অপূর্ব এক জগৎ বলা যায়। দিপালীর সংজ্ঞা ফিরে আসবার পর থেকেই সে চাঁদটাকে এমনিভাবেই দেখছে আর দেখছে চাঁদের আলোয় ঝলমল চারিদিক।

দিপালীকে তাঁরা দু'জন সেই বরফের কুচি দিয়ে দেয়ালের মত ঘেরা জায়গাটায় বন্দী করে রেখে চলে গেলো। যাবার সময় কিছু বললো মেয়ে দু'টি।

একটি কথাও তাদের বুঝতে পারলো না দিপালী, সে শুধু তাকিয়ে রইলো ফ্যাল ফ্যাল করে।

ক্ষুধা তেমন অনুভব হচ্ছে না।

অবাক হচ্ছে দিপালী, যে ভীষণ ক্ষুধা তার পেটে জ্বালা সৃষ্টি করেছিলো এখন তা তেমন নেই। সব যেন কেমন স্নিগ্ধ আর আরামদায়ক মনে হচ্ছে। দিপালী বুঝতে পারলো সে এদের বন্দী কিন্তু তেমন কোনো সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করেনি এরা। চলে গেলো ওরা, কিন্তু একটু পরেই অপর দু'জন নারী এসে হাজির হলো। তাদের দেহেও ঐ একই রকম পোশাক। তুলো আকারের বস্তু দিয়ে চাপ চাপ করে সেই পোশাক তৈরি

করা হয়েছে। ওরা দু'জনও চলে গেলো দিপালী উঠে দাঁড়ালো, শরীরটা এত হাল্‌কা মনে হচ্ছে তার যার জন্য সে হাঁটতে কোনো কষ্ট অনুভব করছে না।

বরফের কুচির দেয়াল ডিঙে বেরিয়ে এলো দিপালী।

দেয়াল ডিঙে বেরিয়ে আসতে তার কোনো কষ্ট হলোনা কারণ শরীরখানা তার অত্যন্ত হালকা মনে হচ্ছিলো।

সেই অদ্ভুত দেয়ালের বাইরে বেরিয়ে আসতেই কানে এলো মিষ্টিমধুর হাসির শব্দ। খিল খিল করে হাসছে, নারীকণ্ঠের হাস্যধ্বনি।

দিপালী অবাক হলো না, কারণ কিছু পূর্বে দু'জন অদ্ভুত পোশাকপরা নারী তাকে এখানে এনে রেখে গেছে। হয়তো বা তারাই হাসছে অমন মিষ্টিভাবে। এগুতে লাগলো দিপালী সামনের দিকে।

কিছুটা এগোতেই হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো সামনের দিকে; বিস্মিত হলো, সে সাদা তুষার স্তূপের একপাশে একটা অদ্ভুত গাছ। ফলেফুলে ভরা গাছটা।

আশ্চর্য, গাছের পাতাগুলো সবুজ নয়, কচি কলাপাতার মত হাল্‌কা রঙের ফুলগুলো হাল্‌কা বেগুনি আর ফলগুলো ফিকে গোলাপী। ভারি সুন্দর লাগছে—অপূর্ব দৃশ্য।

দিপালীর দু'চোখে বিস্ময়, সেকি স্বপ্নময় রাজ্যে এসে পৌঁছেছে নাকি।

একি বিস্ময়কর জগৎ।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় দিপালী। সামনে তাকাতেই বিস্ময়ে থ' মেরে গেলো। সে দেখতে পেলো একটা সুন্দর আসনে উপবিষ্ট তারই রাজকুমার। তাকে ঘিরে ধরে হাসি-আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত অপূর্ব রূপযৌবনভরা তরুণীগুলো।

দিপালী একটা সাদা তুষারের টিলার আড়ালে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলো। অপূর্ব বেশধারিণী তরুণীগণ বনহুরকে ঘিরে কিছু বলছে।

একটা বর্ণও বুঝতে পারছে না দিপালী।

নিশ্চয়ই বনহুরও বুঝতে পারছে না।

তরুণীদের কণ্ঠস্বর শুধু মধুরই নয়, এত মিষ্টি শোনাচ্ছিলো যা বর্ণনা করা যায় না।

দিপালী অবাক হয়ে গেছে, তরুণীদের দেহের পোশাক কি দিয়ে যে তৈরি তা বুঝা যাচ্ছে না। জোছনার আলোতে ভরা চারিদিক, তরুণীদের দেহে জোছনার আলো পড়ে ঝলমল করছে। সাদা তুষার দিয়ে যেন তৈরি এক একটা নারীদেহ। কী সুন্দর লাগছে ওদের! দিপালীর চোখের পলক যেন আর পড়ে না!

দিপালী লক্ষ্য করলো বনহুরের চোখেও তারই মত বিস্ময়, সে অবাক চোখে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। তার চারপাশ ঘিরে এক অপূর্ব সমারোহ।

তরুণীগণ বনহুরের মুখে, গলায় হাত বুলিয়ে খিল খিল করে হাসছে। কেউবা ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে তার গলায়।

দিপালী আরও আশ্চর্য হলো ফুলের মালা দেখে। মালা তো নয় যেন তুলা দিয়ে তৈরি নতুন ধরনের ফুল।

হাসির ফুলঝুরি ঝরে পড়ছে যেন। তরুণীরা তার রাজকুমারকে নিয়ে মেতে উঠেছে।

দিপালীর মনে একটা ঈর্ষাপূর্ণ ভাব জেগে উঠলো।

সে চুপি চুপি এগিয়ে গেলো আরও কাছে।

কিন্তু দিপালী নিকটে পৌঁছবার পূর্বেই তরুণীগণ বনহুরকে নিয়ে হাওয়ায় ভেসে এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। ফুলপরীর মত হাল্‌কাভাবে ওরা চলে গেলো।

থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইলো দিপালী।

এটা কোন্ দেশ?

কোথায় এসেছে তারা?

দিপালী এগুতে লাগলো, কিন্তু বেশিদূর সে যেতে পারলো না, কতকগুলো তরুণী তাকে ঘিরে ধরলো চারপাশ থেকে।

বিস্ময় নিয়ে দিপালী দেখলো এরা তারা নয় যারা তার রাজকুমারকে নিয়ে মেতে উঠেছিলো। এরা আর এক দল তরুণী। কী সুন্দর মিষ্টি তাদের চেহারা, যেন ফুলপরী। দুধে আলতা মেশানো গায়ের রং। গোলাপী দুটি ওষ্ঠদ্বয়। কাজলটানা চোখ। সবাই একই সমান—কেউ খাটো বা লম্বা নয়। চুলগুলো সোনালী বর্ণের, ঠিক রেশমের মত চকচকে।

একনজরে দিপালী সবাইকে দেখে নিলো। বড় বেখাপ্পা লাগছে নিজকে ওদের মধ্যে। ওরা মানুষ না অন্য কোনো জীব ভাবছে দিপালী। ভাবছে নিজের কথা......পৃথিবীর মানুষ সে। সবাই বলে দিপালী অপরূপ, তার মত সুন্দরী খুব কমই নজরে পড়ে অথচ আজ সেই দিপালীর সৌন্দর্য এই তরুণীদের কাছে যেন মলিন হয়ে গেছে। নিজকে অত্যন্ত অশোভনীয় মনে হচ্ছে ওদের কাছে।

দিপালীর দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে, তাকে নিয়ে ওরা কিছু বলাবলি করলো। একটি বর্ণও বুঝতে পারলো না দিপালী। আঃ কি সুন্দরই না ওদের কণ্ঠস্বর, যেন বীণার ঝংকার শুনতে পাচ্ছে সে।

চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে দিপালী। শুধু নারী আর নারী—পুরুষ তো নজরে পড়ছে না। তবে কি পুরুষশূন্য এ রাজ্য?

শুধু আলোর বন্যা।

সে আলোতে নেই কোনো তাপ বা উগ্রতা।

স্নিগ্ধ মধুর আবেশে আলোর বন্যা সমস্ত রাজ্যটাকে দীপ্ত করে তুলেছে।

তরুণীরা ওকে নিয়ে গেলো, কতকটা শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত। বেশ কিছুটা চলার পর দিপালীকে নিয়ে ওরা হাজির হলো বিরাট রাজপ্রাসাদের মত এক অট্টালিকার সামনে।

পথে তেমন লোকজন নজরে পড়লো না দিপালীর তবে চারদিকেও উপরন্তু সৌন্দর্য তার দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো।

পথের দু'ধারে সারি সারি দোকান কিন্তু কোনো মানুষ নেই। দিপালী লক্ষ্য করেছে, তরুণীরা বুঝি নিয়ে আসছে, ইচ্ছামত যা তাদের প্রয়োজন তুলে নিচ্ছে এবং দোকানের সম্মুখে রক্ষিত একটা বাক্সে মুদ্রাজাতীয় কোনো পদার্থ ফেলছে। অপূর্ব এক সমাবেশ।

এতক্ষণে দু'চার জন পুরুষ নজরে পড়লো তার।

এরা বিরাট প্রাসাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রয়েছে। হয়তো প্রহরী হবে। তবে হাতে তাদের কোনো অস্ত্র নেই, শুধু একটা সুন্দর জ্বলজ্বলে লাঠি, হাতের মুঠিতে ধরে রেখেছে।

তাকে নিয়ে তরুণীর পৌঁছতেই পুরুষগণ মাথা নত করে সরে দাঁড়ালো।

দিপালী তখন অবাক হয়ে হা করে প্রাসাদটা লক্ষ্য করছে। সাদা তুষার দিয়ে তৈরি মনিমুক্তাখচিত অপূর্ব সুন্দর রাজপ্রাসাদ।

তরুণীরা হেসে কিছু বললো।

দিপালী যদিও তাদের কথাবার্তার একবর্ণ বুঝতেও পারলো না, তবু সে ওদের সঙ্গে এগুবার জন্য পা বাড়ালো।

তরুণীদল দিপালীসহ এগিয়ে চললো রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে। আরও বিস্ময় ফুটে উঠলো দিপালীর চোখেমুখে, এ যেন স্বর্গপুরী। চারিদিকে সৌন্দর্যের অপূর্ব সমারোহ, সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না সে। তবে এতক্ষণে দু'চারটে পুরুষ তার দৃষ্টিগোচর হলো। দিপালীর মনে হচ্ছিলো এ বুঝি পুরুষবিহীন রাজ্য কিন্তু এখন সে ভুল ভেঙে গেলো। প্রাসাদের অভ্যন্তরে বেশ কিছু পুরুষ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

এখন বেশ বুঝতে পারে দিপালী এ রাজ্য পুরুষবিহীন নয়, এখানেও পুরুষ আছে তবে সংখ্যায় নিতান্ত কম।

দিপালী আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলো পুরুষ হলেও তাদের পোশাক পরিচ্ছদ কতকটা মেয়েলী ধরনের। সাদা ধবধবে তুষার দিয়ে তৈরি

যেন পোশাকগুলো। পোশাকগুলোর স্থানে স্থানে ঝক্ ঝক্ করছে উজ্জ্বল দীপ্ত পাথর।

দিপালী আরও কিছুটা এগুতেই তার কানে প্রবেশ করলো এক অদ্ভুত মিষ্টি সুরের ঝংকার। সে এক অপূর্ব সুরের রেশ, অভিভূতের মত দিপালী সম্মুখে তাকিয়ে থাকে।

তরুণীগণ হয়তো দিপালীর মনের কথা বুঝতে পারলো, কিছু বললো তারা ওকে লক্ষ্য করে। দিপালী একটুও বুঝতে না পারলেও মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো।

দিপালীকে মাথা দুলিয়ে তাদের কথার সায় দিতে দেখে আনন্দে ওরা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, অবশ্য দিপালী ওদের মুখ দেখেই বুঝতে পারলো তাদের মনের কথা।

এবার ওরা দিপালীকে নিয়ে চললো যেদিক থেকে সেই অপূর্ব সুরের রেশ ভেসে আসছিলো সেইদিকে। দিপালী যেন হাওয়ায় ভেসে এগিয়ে যাচ্ছে।

ওরা শুধু ওর হাত দু'খানা দু'দিক থেকে সামান্য হাল্কাভাবে ধরে রেখে ছিলো।

বেশিক্ষণ সময় লাগলো না।

কিছু সময়ের মধ্যে দিপালীসহ তরুণীগণ হাজির হলো একটা হলঘরের মত প্রশস্ত কক্ষে, সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই থ' মেরে গেলো সে। দেখতে পেলো তার রাজকুমার একটা আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে বসে অদ্ভুত ধরনের বীণায় ঝংকার তুলছে অদ্ভুত তরুণীদল।

অভিভূতের মত শুনছে বনহুর।

দিপালীকে দেখে বনহুর যেমন বসেছিলো তেমনি রইল। তার মধ্যে এতটুকু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো না। চোখেমুখেও তার কোনো ভাব দেখতে পেলো না সে। তবে কি রাজকুমার তার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলো ঐ অপূর্ব তরুণীদের পেয়ে? মনের প্রশ্ন মনেই রইলো, কারণ সে এখানে সম্পূর্ণ একা। রাজকুমারই যে তার একমাত্র ভরসা অথচ সেও চিনে না চেনার ভান করছে। দু'চোখ ফেটে পানি ঝরতে চাইলো দিপালীর কিন্তু সে নিজকে সংযত করে রাখলো অতি কষ্টে। সুরের আবেশে আত্মহারা বনহুর—সে দিপালীর দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো।

যে আসনে বনহুর বসে আছে তা রাজসিংহাসনের চেয়েও সুন্দর। নীলমনির মত নীলাভ উজ্জ্বল দীপ্ত পাথরখণ্ড দিয়ে গোটা সিংহাসনটা তৈরি করা হয়েছে। উজ্জ্বল নীল আলো ছড়িয়ে আছে হলঘরটার মধ্যে।

দিপালী পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সুরের ঝংকার থেমে গেলো না বরং আরও সুমধুর সুরে প্রতিধ্বনিত হলো। কি অপূর্ব সে সুরের আবেশ।

তরুণীদল দিপালীকে নিয়ে ওদিকে একটা আসনে বসিয়ে দিলো। দিপালী দেখলো আসনটা কাঠ দিয়ে তৈরি নয়। তুষার জাতীয় হাল্‌কা বস্তু দিয়ে তৈরি। তুষারের মাঝে মাঝে হীরকখণ্ডের মত উজ্জল পাথর বসানো রয়েছে।

আরও আশ্চর্য ঐ পাথরগুলো দিয়ে আলোর দ্যুতি ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। উজ্জ্বল দ্বীপ্ত নীলাভ আলোর ছটা। মুগ্ধ দিপালী তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

সম্মুখের আসনে বসে স্বয়ং দস্যুরাজ।

দিপালীর মনে অভিমান।

কেন সে দেখেও না দেখার, না চেনার ভান করছে। বারবার বনহুর তাকাচ্ছে দিপালীর দিকে কিন্তু তার সে চাহনির মধ্যে নেই কোনো পরিচয়ের আভাস।

দিপালী যখন অন্যমনস্কভাবে ভাবনার গভীরে তলিয়ে সুরের ঝংকারে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত আবিষ্ট হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে একটা তরুণী কিছু পানীয় জাতীয় পদার্থ এনে ধরলো তার সম্মুখে।

দিপালীর ক্ষুধা ছিলো কিন্তু পূর্বের মত তীব্র নয়। কারণটাও সে জানে না কেন তার ক্ষুধার ভাব এমন কমে গেছে। প্রশ্ন সে মনকে করেছে কয়েকবার কিন্তু তার জবাব সে পায়নি মনের কাছে। ইচ্ছা হচ্ছে রাজকুমারকে সে জিজ্ঞাসা করে। অনেক কথা ভিড় জমিয়ে উঠেছে তার মনের গহনে কিন্তু সে বলতে পারছে না, একটা বাধা তার কণ্ঠনালীকে আড়ষ্ট করে দিয়েছে। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, বলতে পারছে না কিছু।

বনহুর আসনে হেলান দিয়ে বসে আছে, মিষ্টিমধুর হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটের কোণে। বড় সুন্দর লাগছে তাকে। দেবকন্যাদের সঙ্গে সেও যেন দেবপুরুষ বনে গেছে। নীল দুটো উজ্জ্বল চোখ, বলিষ্ঠ দীপ্ত মুখমন্ডল। প্রশস্ত ললাট, একরাশ এলোমেলো চুল ছড়িয়ে পড়েছে তার ললাটের স্থানে স্থানে।

যে তরুণী তার সম্মুখে পানীয় জাতীয় তরল পদার্থ তুলে ধরলো, সে কিছু বললো এবার দিপালীকে লক্ষ্য করে।

দিপালী একবর্ণও বুঝলো না।

তবু সে হাতে তুলে নিলো সেই তরল পদার্থের অদ্ভুত ধরনের গেলাসটা। চ্যাপ্টা চারকোণা গেলাস, কি বস্তু দিয়ে গেলাসটা তৈরি করা হয়েছে তা বোঝা না গেলেও এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, এমন কোনো বস্তু

দিয়ে গেলাসটা তৈরি যা পৃথিবীর মানুষের কোনোদিন দৃষ্টিগোচর হয় নি। সোনা বা রূপো দিয়ে তৈরি নয়, অন্য এমন কোনো জিনিষ দিয়ে গেলাসগুলো তৈরি যা পৃথিবীর মানুষের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়।

তরল পদার্থগুলো কি তাও জানে না দিপালী, তবু সে গেলাসটা তুলে নিলো হাতে।

এক নিঃশ্বাসে পান করে ফেললো দিপালী সবটুকু পানীয় একি অপূর্ব স্বাদ—এ যে অমৃত ধারা!

দিপালীর সমস্ত দেহমনে প্রশান্তি নেমে আসে, ধীরে ধীরে তলিয়ে যায় সে এক সীমাহীন মোহময় পরিবেশে। এত আনন্দ এত তৃপ্তি বুঝি কোনোদিন সে পায় নি। একনিমিশে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব কোথায় দূরীভূত হয়ে গেলো। দিপালীর চোখ দুটো দীপ্তময় হয়ে উঠলো, ভুলে গেলো সে তার অতীত জীবনের কথা।

সেও ওদের মতো বনে গেলো ধীরে ধীরে।

কতক্ষণ বা কতদিন কেটেছে খেয়াল নেই দিপালীর। হঠাৎ একদিন দিপালীর হুশ্ হলো। সে তখন একা-শুধু একা, আশে পাশে কেউ নেই।

চোখ মেলতেই ধূসর রঙের দেয়ালঘেরা একটা জায়গা নজরে পড়লো। শুধু দেয়াল নয়, তার চারপাশে বসে বীণাতে ঝংকার দিচ্ছে কতকগুলো তরুণী।

আরও কয়েকজন মিলে তার চারপাশে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাচ্ছে তার মুখের দিকে। তারাও তরুণী তবে তাদের হাতে বীণা নেই। রূপালী আলোর বন্যায় জায়গাটা ঝলমল করছে।

দিপালী দেখলো সে শায়িত নেই, বসে আছে। তাকে ঘিরে আছে অদ্ভুত সে তরুণীদল। দিপালীর ধীরে ধীরে মনে পড়লো সব কথা। সে সুমিষ্ট তরল পদার্থ পান করার সঙ্গে সঙ্গেই এক অনাবিল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তলিয়ে গিয়েছিলো তার গোটা অন্তরটা। ভুলে গিয়েছিলো দিপালী সব কথা।

এবার মনে পড়লো কে সে আর এখানে কেমন করেই বা সে এলো। মনে পড়লো তার রাজকুমারের কথা!

কতদিন দিপালী এমন অবস্থায় ছিলো জানে না। সে দেখলো এখন তার নিজের পরনে ঐ তরুণীদের মতই সাদা তুষারে তৈরি পোশাক। গলায় হাতে অদ্ভুত পাথর বসানো মালার ছড়া। মালার ছড়া থেকে উজ্জ্বল দীপ্ত আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে।

দিপালী এসব কখন পরেছে সে.নিজেই ভেবে পায় না। তবে সে যে নিজের হাতেই এসব পরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দিপালী তাকায় সবার মুখের দিকে। সন্ধান করে পেল সে তার রাজকুমারের কিন্তু রাজকুমারকে দিপালী দেখতে পায় না কোথাও।

খুব ভাবনায় পড়ে সে।

দিপালীর মোটেই ভালো লাগে না, একটা গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠে তার চোখেমুখে।

দিপালী ওদের মধ্যে বেশ আছে।

নতুন এক রাজ্য—এ রাজ্যে কোনো দুঃখকষ্ট বা ব্যথা নেই। আছে শুধু প্রাণভরা আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

দিপালীকে নিয়ে তরুণীরা বেরিয়ে আসে সেই ধূসর বেষ্টনীর বাইরে। শুধু আলো আর আলো—চারিদিকে শুধু আলোর বন্যা। তরুণীরা তার হাত ধরে নিয়ে চলে, পথ নয় যেন তুষার ঢাকা। মনিমুক্তার স্তূপ, থোকা থোকা জোনাকির মত পাথরগুলো জ্বলছে।

তরুণীরা তাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে সে জানে না। হাল্‌কা দেহ, হাঁটতে তার কোনোই কষ্ট হচ্ছে না।

পথে আলোর বন্যা।

মাঝে মাঝে দু'চারজন তরুণী হাতে নানা ধরনের ফুলঝার ঠিক যেন তারার মালার থোকা, ওরা হেঁটে যাচ্ছে এদিক থেকে সেদিকে।

দু'চারজন পুরুষও নজরে পড়ছে তার।

যত দেখছে ততই বিস্ময় বাড়ছে দিপালীর।

পৃথিবীর মানুষ তো এমন নয়। তাদের মনভরা হিংসা-বিদ্বেষ, বুকভরা হাহাকার। শুধু ব্যথা-বেদনা আর দীর্ঘশ্বাস।

আর এখানে সবাই আনন্দে উচ্ছল।

বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা বড় একটা নজরে পড়ছে না। কাউকে অসুস্থ বা জরাগ্রস্ত মনে হচ্ছে না। সবাইকে তরুণ আর তরুণী মনে হচ্ছে, কারো বয়স যেন ত্রিশের বেশি নয়।

দিপালী যখন গভীরভাবে এসব নিয়ে ভাবছে তখন হঠাৎ আচম্‌কা দু'জন পুরুষ এসে তাদের সম্মুখে দাঁড়ালো। কি যেন বললো তারা তরুণীগণকে লক্ষ্য করে।

তরুণীরা জবাব দিলো।

একটা বর্ণও বুঝলো না দিপালী।

তরুণীরা এবার তাকে নিয়ে গেলো অপর একস্থানে। মনে হলো এটা কোনো হোটেল বা সরাইখানা। বিরাট হলঘরের মত প্রশস্ত জায়গা, আসন ধরনের বেশকিছু বসবার বস্তু আছে। কিছু নারী এবং কিছু পুরুষ বসে আছে নিজ নিজ আসনে।

দিপালীকে নিয়ে ওরা বসিয়ে দিলো একটা আসনে। হিমশীতল অত্যন্ত আরামদায়ক আসনটাতে বসে দিপালী খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো। তাকালো সে চারিদিকে, সবাই নিজ নিজ আসনে বসে হাসছে, কথা বলছে এবং খাচ্ছে। কিন্তু এত সুন্দর আর মিষ্টি তাদের হাসির লহরী, এত সুন্দর তাদের কণ্ঠস্বর। দিপালী অভিভূত হয়ে যায়।

কখন যে তার সম্মুখে খাবার এসেছে টেরই পায়নি দিপালী। ভালভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো এখানে কোনো বয়-বেয়ারা নেই। খাবার আপনা আপনি টেবিলে আসছে। খাওয়া শেষ হল। শূন্য পাত্রগুলো আপনা আপনি চলে যাচ্ছে সম্মুখের টেবিল জাতীয় বস্তুটার উপর থেকে।

দিপালী কোনোদিন এমন পরিবেশ উপভোগ করেনি। রূপালী আলোয় হোটেল জাতীয় হলঘরটা ঝলমল করছে।

এত মিষ্টি আলো কোথা থেকে আসছে।

দিপালী তাকিয়ে দেখতে লাগলো অবাক চোখে। ছাদের দিকে তাকাতেই বিস্মিত হলো সে—একি, ছাদ কোথায়।

দিপালী দেখলো তাদের মাথার উপরে কোনো আবরণ বা ছাদ নেই, শুধু সীমাহীন আলোর বন্যা। দিপালী ভাবতে থাকে এখনও তার স্বাভাবিক সংজ্ঞা হয়তো ফিরে আসেনি, তাই সে স্বপ্নের মায়াজালে আবদ্ধ রয়েছে। তাই হয়তো চোখে এমন রঙের ফুলঝুরি দেখছে কিন্তু......না, সে মোটেই সংজ্ঞাহীন নয়। বেশ বুঝতে পারছে সে স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন রয়েছে।

দিপালী সম্মুখস্থ টেবিল আকার আসন বা বস্তুটার উপরে রক্ষিত থালা থেকে তুলে নিলো খাবার এবং খেতে শুরু করলো। এখন তার অনেকটা সয়ে উঠেছে সৌরজগতের আবহাওয়া। নতুন এক সৃষ্টিজগতে এসে নতুন আবিষ্কারের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে যেন দিপালী।

যা সে খাচ্ছে তা কি দিয়ে তৈরি বুঝতে পারে না দিপালী। এত সুস্বাদু জিনিস সে কোনোদিন খায়নি। সামান্য কিছু খেতেই তার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়ে গেলো।

কি আনন্দ, শুধু প্রাণভরা শান্তি আর শান্তি।

দিপালী তরুণীদের কথা বুঝতে না পারলেও দিনে দিনে সে তাদের সঙ্গিনী বনে গেলো।

এখন দিপালী সব জায়গায় যেতে পারে।

এখানে হোটেল আছে, ঘরবাড়ি আছে কিন্তু ছাদ নেই। খোলা ছাদবিহীন কক্ষ। এখানে কোনো আলো জ্বালাতে হয় না, সব সময় আলোর বন্যায় চারিদিক ঝলমল করছে।

দিপালী অবাক হয়, কারণ এমন ধরনের প্রাসাদ সে কোনোদিন দেখেনি। প্রাসাদ তো নয়, বরফ জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি চার পাশে দেয়ালঘেরা জায়গা।

প্রাসাদ বা হোটেল জাতীয় কক্ষটার চারপাশে প্রশস্ত পথ। যারা প্রবেশ করছে তারা শৃঙ্খলার সঙ্গে আসন গ্রহণ করছে। আর যারা খানাপিনা শেষ করছে তারা আলগোছে বেরিয়ে আসছে।

কেউ কোনো কথা বলার প্রয়োজন মনে করছে না।

সব দিপালীর কাছে অবাক লাগছে।

হোটেলে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করার পর পরই সম্মুখের টেবিলে আকার বস্তুটার উপরে খাদ্যসম্ভার এসে হাজির। যেন অলৌকিক ব্যাপার, যেন কোনো ব্যক্তি অদৃশ্যভাবে কাজ করে চলছে।

খাওয়া শেষে সম্মুখের টেবিল থেকে খাবারের শূন্য পাত্রগুলো তেমনি অদৃশ্য ব্যক্তির হাতের পাশে চলে গেলো তাদের দৃষ্টির আড়ালে।

দিপালী অবাক হলো কিন্তু তার মনে যে প্রশ্ন উঁকি দিলো তার কোনো জবাব পেলো না।

তরুণীরা তাকে নিয়ে এবার বেরিয়ে এলো বাইরে। হাল্‌কা ভাবে হেঁটে চললো সামনের দিকে। দিপালীর চোখে সবই বিস্ময়, কোথাও সবুজ বা অন্য কোনো রঙের সমারোহ নেই। শুধু হাল্‌কা বেগুনী রঙের বৃক্ষ লতাপাতা গুল্ম। ফলমূল যা নজরে পড়ছে তার রঙও ফিকে বেগুনী—ভারী সুন্দর সব বৃক্ষলতা এবং ফলগুলো।

জীবজন্তু বা পাখি নজরে পড়েনি এখনও।

পথঘাটমাঠ কোথাও কোনো যান বাহনও নজরে পড়ে না। সবাই হেঁটে পথ চলছে, কিন্তু এত দ্রুত তারা হাঁটতে পারে সত্যি চোখে ধাঁধা লাগে দিপালীর। দিপালী নিজেও এমন হাল্‌কাভাবে হাঁটে যে নিজেও বুঝতে পারে না শরীরটা এত ফুরফুরে পাতলা লাগে কেন?

দিপালী শুধু খুঁজে ফেরে তার রাজকুমারকে। আজ ক'দিন হলো রাজকুমারের সন্ধান করে ফিরছে সে কিন্তু তার দেখা পায়নি। অজানা অচেনা দেশে যদিও তার কোনো কষ্ট হচ্ছে না তবু সব সময় দিপালী নিজেকে বড় একা নিঃসঙ্গ মনে করছে।

পৃথিবী ছেড়ে তারা যে আজ নতুন এক জগতে এসে উপস্থিত হয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই। তবে এটা কোন্ জগৎ, কোন্ গ্রহ তা বোঝা মুস্কিল।

দিপালীর দৃষ্টি যত দূর যায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে শুধু সাদা আর হাল্‌কা বেগুনির সমারোহ। বৃক্ষ লতা পাতা সব বেগুনি রঙের।

এখানে বৃষ্টি হয় না বুঝতে পেরেছে দিপালী। সে কারণেই কোন ছাদের প্রয়োজন নেই। সূর্যের প্রখর তাপ নেই এখানে, সব সময় একটা স্নিগ্ধ আলোর বন্যা চারিদিক উজ্জ্বল দীপ্ত করে রেখেছে।

ছোট ছোট পাহাড় এবং স্থানে স্থানে জলপ্রপাত নজরে পড়ছে তার। কিন্তু সব যেন নতুন ধরনের। পাহাড় বলতে ঠিক আমাদের দেশের পাহাড়পর্বত নয়, কেমন যেন উঁচু উঁচু স্তর। কতকটা উইয়ের ঢিপির মত, যেন এক একটা মিনার। সাদা ধবধবে তুষারে ঢাকা মিনারগুলোর উপরে দীপ্ত উজ্জ্বল আলোর ছটা অপূর্ব শোভা বর্ধন করেছে। যেদিকে তাকায় দিপালী সেই-দিকেই শুধু সৌন্দর্যের রাজ্য।

এ যেন স্বর্গপুরী।

দিপালী কোনোদিন ভাবতে পারেনি এমন এক জগতে তারা কোনোদিন আসতে পারবে।

একদিন দিপালী একাই বসেছিলো, আশেপাশে কেউ নেই উঠে দাঁড়ালো সে, পা বাড়ালো সম্মুখের দিকে। যে দিকে দৃষ্টি যায় এগিয়ে যাচ্ছে দিপালী। অনেক দূরে এসে পড়ে। চারিদিকে শুধু আলো আর আলো। মাঝে বেগুনি রঙের ফলের বাগান। নানা ধরনের ফুলফলে ভরা বৃক্ষগুলো।

দিপালী সেই বাগানে প্রবেশ করে।

বৃক্ষগুলো বেশি নয়, লম্বায় তার চেয়ে কিছু বড় হবে।

দিপালী ইচ্ছামত কোঁচায় ফল তুলে নিলো, তারপর প্রাণভরে খেলো। এত মিষ্টি সুস্বাদু ফল সে কোনোদিন খায়নি।

হঠাৎ কে যেন তার পিছন থেকে তাকে ধরে ফেললো। দেখলো দুজন পুরুষ। তাকে ধরে ফেলে কি যেন বললো ওরা, দিপালী তার একবর্ণও বুঝতে পারলো না। শুধু সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলো।

ওরা দু'জন দিপালীর হাত দু'খানা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো।

দিপালী লক্ষ্য করলো, দড়ি তো নয় যেন রেশমের একগাছা হাল্‌কা ফিতা! দিপালীকে ওরা হাত বেঁধে নিয়ে চললো আর ফলগুলো নিয়ে তার সুন্দর একটা ঝুড়ির মধ্যে।

হঠাৎ ওরা ঝুড়ি কোথায় পেলো ভাবতেই তার দৃষ্টি চলে গেলো আশেপাশে, সে দেখলো আরও কতকগুলো পুরুষ ঐ ধরনের ঝুড়ি নিয়ে ফল তুলতে শুরু করে দিয়েছে। দিপালী বুঝতে পারলো এটা কারও বাগান। সে বাগানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছে এবং ফল ছিড়েছে। দিপালী নিজের ভুল বুঝতে পারলো কিন্তু সে কি বলে ক্ষমা চাইবে—তার একটা কথাও তারা বুঝতে পারবে না জানে সে এবং সে কারণেই নীরব থাকতে বাধ্য হলো।

দিপালীকে যখন ওরা নিয়ে চলেছে তখন দিপালী অবাক চোখে সব দেখছে আর যাচ্ছে। কোন যানবাহনের এখানে প্রয়োজন হয় না। লোকগুলো তাকে নিয়ে যেন হাওয়ায় ভর করে এগিয়ে যাচ্ছে। হাঁটতে ওদের মোটেই কষ্ট হচ্ছে না।

দিপালী এখানে আসার পর আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে যা অতি আশ্চর্যকর। তাদের নিয়ে যে যানটা উল্কা বেগে আকাশপথে ধাবমান হয়ে একেবারে চাঁদের দেশে এনে পৌঁছে দিয়েছিলো, সে যানের মধ্যে যখন ক্যারিলংকোর সঙ্গে রাজকুমার মল্লযুদ্ধ চলছিলো, তখন কাঁচের শার্সী ভেঙে গিয়েছিলো এবং সেই ভাঙা জায়গা দিয়ে ক্যারিলংকে বাইরে নিক্ষেপ করেছিলো রাজকুমার তখন মুহূর্তের জন্য তাদের যানটার মধ্য হতে অক্সিজেন বেরিয়ে যাওয়ায় মৃত্যু ঘটবার উপক্রম হয়েছিলো তাদের। ঐ মুহূর্তে যদি রাজকুমার দ্রুত সেই ভাঙা জায়গায় আঁঠালো প্লাষ্টিক পেপা সংযুক্ত করে না দিতে পারতো তাহলে মৃত্যু তাদের সেদিন অনিবার্য ছিলো। চাঁদের পিঠে কোনো অক্সিজেন নেই, সেখানে মানুষ বা কোনো প্রাণী জীবন ধারণে সক্ষম নয় তা বেশ উপলব্দি করতে সক্ষম হয়েছে দিপালী। আর এখন যেখানে সে রয়েছে এটাও পৃথিবী ছেড়ে আর এক জগৎ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সে জানে না এটা কোন্ জগৎ এটা যে কোনো সৌরজগৎ তা সে বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছে, তবে এখানে অক্সিজেনের কোন অভাব নেই। বরং পৃথিবীর আলো বাতাসের চেয়ে এখানে সে উপলব্ধি করছে অনেক উন্নত মানের আবহাওয়া। এখানে তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় না, এখানে হাঁটতে বা চলতে কোনো অসুবিধা হয় না, বরং সব কাজে তার মনে আসে অফুরন্ত আনন্দ উচ্ছাস। ভারী ভাল লাগে তার।

হঠাৎ ভাবনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, চমকে উঠে দিপালী। অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর কেউ যেন নাম ধরে ডাকলো তার। ফিরে তাকাতেই দীপ্ত হয়ে উঠলো তার চোখ দুটো, অস্ফুট শব্দে বলে উঠলো—রাজকুমার......

এগিয়ে আসছে বনহুর তার দিকে।

বনহুরকেও অত্যন্ত খুশি লাগছে, সেও যে দিপালীকে খুঁজে ফিরছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দিপালী নিজকে সংযত রাখতে পারলো না, ছুটে গিয়ে ছোট বালিকার মত বনহুরের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলে উঠলো—এ ক'দিন কোথায় ছিলেন রাজকুমার?

বনহুর বললো—এখন নয়, পরে সব বলবো। শোন দিপালী, আমি পথের সন্ধান পেয়েছি..........

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো দিপালী—পথের সন্ধান, বলেন কি আপনি। পথ আছে পৃথিবীতে ফিরে যাবার?

আছে।

সত্যি!

হাঁ দিপালী। কিন্তু এ দেশ কি তোমার ভাল লাগছে না?

লাগছে? খুব ভাল লাগছে কিন্তু.........

বলো?

পৃথিবীর মানুষ আমি এই অদ্ভুত রাজ্যে.........

নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছো না, এই তো?

দিপালী ভারী গলায় বললো—হাঁ।

বনহুর একটু হেসে বললো—যদি এখান থেকে আর কোনো দিন আমরা ফিরে যেতে না পারি তাহলে?.........

তাহলে?

বলো কি করতে?

রাজকুমার, আপনি যদি পাশে থাকেন তাহলে যেখানেই থাকি না কেন স্বর্গসুখ উপভোগ করবো। ভুলে যাবো পৃথিবীর কথা।

কিন্তু তা হয় না, তা হয় না দিপালী—পৃথিবীর মানুষ আমরা, শত সুখ হলেও আসলে তৃপ্তি পাবো না। জানো দিপালী, আমি পথের সন্ধান পেয়েছি।

তাহলে পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবো?

নিশ্চয়ই পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবো আমরা। যদিও এক অদ্ভুত যানের সন্ধান পেয়েছি।

রাজকুমার!

হাঁ দিপালী। এসো আমার সঙ্গে, নিরিবিলি কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।

চলুন।

বনহুর আর দিপালী এগুলো।

অতি চমৎকার পথ।

বেশ নির্জন।

শান্ত স্নিগ্ধ আলোকরশ্মিতে চারিদিক ঝলমল করছে। ধীরমন্থর গতিতে পথ চলছে ওরা। এদেশে কোনো ঝিঁ ঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত আওয়াজ নেই, নেই কোনো কলকণ্ঠের প্রতিধ্বনি। নেই কোন যন্ত্রের কর্কশ আওয়াজ।

একটি ধূসর রঙের পাথুরে ঢিপির পাশে এসে বসলো বনহুর আর দিপালী।

কতদিন পর বনহুরকে দিপালী কাছাকাছি পেয়েছে। অনাবিল আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে তার মন, তার মনের উচ্ছ্বাসের আভাস স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে।

বনহুর বেশ উপলব্ধি করে দিপালীর মনোভাব। তবু প্রথমে সে কিছু বলতে চায় না, দিপালীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে মাত্র।

দিপালী বলে—রাজকুমার, প্রথমে একটা কথার জবাব আপনি দিন।

প্রশ্ন করে দিপালী?

ক'দিন পূর্বে আপনাকে আমি যে রূপে দেখেছি সে রূপ কি আপনার সত্যিকারের রূপ না অন্য কিছু?

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

রাজকুমার সে দিন আপনি যখন তরুণীদের মধ্যে বসেছিলেন, আপনার চারপাশ ঘিরে যখন সেই অদ্ভুত নারীর দল হাস্যালাপে মত্ত ছিলো তখন আপনি আমাকে দেখেও না চেনার ভান করেছিলেন কেন?

দিপালী, এখনও আমি তোমার কথা বুঝতে সক্ষম হচ্ছি না। তুমি কি বলছো আমি তোমাকে দেখেও না দেখার ভান করেছি?

হাঁ, আপনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন অথচ......

কোনো কথা বলিনি?

হাঁ, শুধু কথা বলা নয়, আপনি আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন আমাকে আপনি কোনোদিনই দেখেননি।

দিপালী, বিশ্বাস করো তোমাকে আমি দেখেও না দেখার ভান কোনোদিন করি নি।

তাহলে কি.........

হাঁ, আমি তোমাকে অনেক খুঁজছি কিন্তু পাইনি। যখন পেলাম তখন তো আমি তোমার পাশে ছুটে এলাম।

তবে কি.........দিপালী বিস্ময়ভরা চোখে তাকায় বনহুরের মুখের দিকে। বলে উঠে সে পুনরায়—আপনি কি তাহলে......

বিশ্বাস করো দিপালী আমার কিছু স্মরণ নেই।

এবার আমি বেশ বুঝতে পারছি সেই অমৃত সুধা যা পান করার পর আমি নিজেও সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম সেই সুধা আপনিও পান করেছিলেন।

হয়তো তোমার কথাটাই সত্য দিপালী, কারণ তুমি যা বলছো আমার কিছু স্মরণ নেই।

তাহলে আপনি কি......

হাঁ, আমি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম যদিও তুমি আমাকে দেখেছো, আমি তোমাকে দেখেছি কিনা স্মরণ করতে পারছি না। তবে যখন স্মরণ হলো তোমার কথা তখন আমি দেখলাম আমার চারপাশে অনেকগুলো তরুণী—কারও বা হাতে বীণা, কারও হাতে বেহালা, কারও হাতে ঐ ধরনের বাদ্যযন্ত্র। অবশ্য সবার হাতেই কোনো না কোনো বাদ্যযন্ত্র কিন্তু তা আমাদের পৃথিবীর মানুষের তৈরি বাদ্যযন্ত্রের মত নয়, ওগুলো আশ্চর্য ধরনের। কিন্তু সবাইকে দেখলাম গভীর নিদ্রায় মগ্ন!

আমি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম বহু তরুণী এবং তাদের সবার হাতেই নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র এ ছাড়াও রয়েছে এক একটা শূন্য পাত্র সবার পাশে।

বুঝতে পারলাম কিছু পান করার জন্যই তারা সংজ্ঞা হারিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন রয়েছে। মনে পড়লো তোমার কথা, ঐ তরুণীদের মধ্যে খুঁজলাম তোমাকে কিন্তু কোথাও তোমাকে পেলাম না, তখন সেই স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে চললাম।

কিছুটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ কানে এলো এক বিস্ময়কর আওয়াজ।

তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লাম সাদা ধবধবে টিলার আড়ালে। সম্মুখে তাকিয়ে দেখলাম—না, কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাকালাম মাথার উপরে।

কি দেখলেন আপনি?

যা দেখলাম তা অতি বিস্ময়কর। একটা কচ্ছপ আকার জীব ঠিক আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে উড়ে নিচে নেমে আসছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, জীবটা নিচে নেমে এলো এবং স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

তারপর?

বলছি, মনোযোগ সহকারে শোন। একটু পূর্বে তোমাকে বলেছি সব বললো—এবার সে কথাই বলছি।

বলুন?

জীবটা নিচে নামতেই তার চারখানা পা বেরিয়ে এলো। একটু উঁচু হয়ে দাঁড়ালো জীবটা কিন্তু আশ্চর্য, চারখানা পায়ের মধ্য হতে চারজন পুরুষ বেরিয়ে এলো।

বলেন কি রাজকুমার?

হাঁ অদ্ভুত বটে।

তারপর?

সেই চারজন পুরুষ, তাদের দেহের পোশাকগুলো আরও আশ্চর্য। তারা জীবটার পায়ের মধ্য হতে বেরিয়ে আসতেই আমার সন্দেহ হলো, সত্যি কি

ওটা জীব না অন্যকিছু। ভালভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম ওটা কোনো জীব বা জন্তু নয়। ওটা একটা অদ্ভুত যান।

দিপালীর চোখেমুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়।

বনহুর বলে চলেছে—আমি খুব ভালভাবে লক্ষ্য করছি লোকগুলোর কার্যকলাপ। তারা কচ্ছপ জাতীয় যানটার মধ্য হতে বেরিয়ে আসতেই কচ্ছপটার পাগুলো গুটিয়ে গেলো। আমার মনে হচ্ছিলো তখন কচ্ছপটা যেন এবার নিশ্চিন্তে আরাম করে বসলো।

রাজকুমার, আপনি তখনও আড়ালে রয়েছেন?

হাঁ, আমি সেই ধূসর রঙের পাথরটার আড়ালে আত্মগোপন করে সব দেখছি। দেখলাম লোকগুলো চলে গেলো যেন যন্ত্র চালিত পুতুলের মত দ্রুতগতিতে। নিমিষে ওরা উধাও হলো।

কোথায় গেলো কেন গেলো জানি না, তবে অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা ফিরে এলো এবং যানটার পাশে এসে তার পিছন অংশে হাত দিয়ে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে যানটার পেটের ভিতর হতে বেরিয়ে এলো চারখানা পা। চারজন লোক যারা যানটার পাশে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত কৌশলে কাজ করছিলো তারা আমাদের পৃথিবীর মানুষ নয় এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, কারণ তাদের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা এবং কথাবার্তা তারা যা বলছিলো তার এক বর্ণও আমি বুঝতে পারছিলাম না।

দিপালী প্রশ্ন করে বসলো—আপনি কি তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন?

হাঁ পাচ্ছিলাম।

বুঝতে পারছিলেন কি তাদের কথাবার্তা?

না. মোটেই না। ওরা পৃথিবীর মানুষ নয়, ওরা সৌরজগতের নতুন কোনো গ্রহ থেকে এসেছে, অথবা যে গ্রহে আমরা এখন রয়েছি এই গ্রহের মানুষ তারা।

তারপর?

ওরা নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা করলো তারপর চারজন যানটার চার পায়ের মধ্যে দিয়ে খোলের মধ্যে প্রবেশ করলো। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, যানটা উল্কাবেগে উঠে গেলো উপরের দিকে, তারপর আর নজরে পড়লো না। জানো দিপালী আমার মনে হয় ওরা আবার আসবে এবং ঐ স্থানে অবতরণ করবে আজ না হয় যে কোনোদিন...

তাহলে আপনি যে বললেন আমরা নাকি পথের সন্ধান পেয়ে গেছি?

হাঁ, কতকটা তাই। ওরা মানে ঐ অদ্ভুত যানটা পুনরায় ফিরে আসবে এবং আমি ঐ যানটাকেই আমাদের পৃথিবীতে ফিরে যাবার পথ হিসেবে গ্রহণ করেছি।

কিন্তু কবে কোন্ দিন আমাদের সে সুযোগ আসবে?

অনিশ্চিত সে দিন দিপালী, তবে আশা আছে একদিন আমরা হয়তো সে সুযোগ পাবো।

কিন্তু.........

বলো?

আমি যে হাঁপিয়ে উঠেছি রাজকুমার। যখন আপনি আমার পাশ থেকে সরে যান্ তখন সব আনন্দ সব সুখ আমার মন থেকে মুছে যায়। বড় একা নিঃসঙ্গ মনে হয় আমার।

দিপালী, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাইনি। আমি জানি না কখন সরে গেছি তোমার পাশ থেকে।

আর তো সরে যাবেন না রাজকুমার?

ইচ্ছা করে দূরে সরে যাই না দিপালী, হয়তো অনিচ্ছায় আমি হারিয়ে যাই তোমার কাছ হতে।

কিন্তু আর আমি আপনাকে হারিয়ে যেতে দেবো না, হারিয়ে যেতে দেবো না রাজকুমার!

বনহুরের ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, বললো সে—ভাবতেও পারিনি এমনভাবে সৌরজগতে এসে পড়বার সুযোগ ঘটবে। দিপালী, এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য বলতে হবে।

দিপালী বললো—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতাম, এখন সুস্থ অবস্থায় জেগে জেগে দেখছি। দেখছি নতুন এক আবিষ্কার। পৃথিবীর সঙ্গে এ রাজ্যের কোনো মিল নেই।

তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য নয় দিপালী। তুমি ভালভাবে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে পৃথিবীর সবকিছুর সঙ্গেই এখানের সবকিছুর যথেষ্ট মিল আছে তবে হুবহু নয়। যেমন পৃথিবীর গাছপালাগুলো আর সৌরজগতের গাছপালাগুলোর বেশি তফাৎ নেই। শুধু রঙের পরিবর্তন, পৃথিবীর বৃক্ষলতা সবুজ আর এখানে হাল্‌কা বেগুনি। পৃথিবীর মানুষ আর এই অদ্ভুত রাজ্যের মানবদেহের তেমন কোনো প্রভেদ নেই। তবে সৌরজগতের আবহাওয়ার সঙ্গে এদের চেহারার কিছু আলাদা সামঞ্জস্য আছে, এটা তুমি নিজেও লক্ষ্য করছো দিপালী।

হাঁ রাজকুমার, এরাও মানুষ কিন্তু এদের চেহারা পৃথিবীর মানুষের তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর, অপরূপ বলা যায়......

যায় না সত্যই তাই। শুধু অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারীই এরা নয়, এরা এক অদ্ভুত শক্তির অধিকারী যা সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই। তাছাড়া আরও একটা বিস্ময়কর জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি যা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলছে।

দিপালী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বলে চলেছে—বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এরা সহজে বুড়ো হয় না, এদের মধ্যে ক'দিন অবস্থান করে জানতে এবং বুঝতে পারলাম এক এক জনের বয়স প্রায় দু'শ থেকে তিন'শ বছর।

আশ্চর্য।

হ্যাঁ, অত্যন্ত আশ্চর্য বটে, আমি এদের জীবন ইতিহাস উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। ব্যাধি, জরা, মৃত্যু সহজে এদের স্পর্শ করে না, কারণ এখানের আলো-বাতাসে এমন একটা গুণ বা শক্তি আছে যার জন্য এখানকার মানুষ নিরোগ।

সত্যিই আমি নিজেও আশ্চর্য হয়েছি রাজকুমার, এখানে কোনো বুড়ো মানুষ আমার নজরে পড়েনি, এ ছাড়াও কোনো অসুস্থ মানুষ আজও দেখতে পাইনি।

দিপালী, আমি আরও জানতে পেরেছি এরা আমাদের মত মাছ মাংস খায় না, এরা ফলমূল এবং এক ধরনের সুধা পান করে। যে সুধা পান করে এরা ভুলে যায় বা ভুলে থাকে সবকিছু। হয়তো বা ঘুমিয়ে থাকে এক সপ্তাহ, যেমন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম বেশ কয়েক দিন। আর সে কারণেই তুমি আমাকে খুঁজে পাওনি দিপালী......এবার শোন, আমরা যদিও এদের কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারছি না। তবু বুঝবার চেষ্টা করতে হবে এবং জানতে হবে সবকিছু।

রাজকুমার, আপনি কি থাকতে চান সৌরজগতের এই অদ্ভুত রাজ্যে?

হাঁ দিপালী, তবে চিরদিনের জন্য নয়, সুযোগ হলেই আমরা পৃথিবীর বুকে ফিরে যাবো। একটু থেমে বললো বনহুর—এমন এক পরম সৌভাগ্য যখন আমাদের ভাগ্যে এসেছে তখন আমরা বিফল মনোরথে রিক্ত হস্তে ফিরে যাবো না দিপালী। তুমি আমার পাশে থেকে সাহায্য করবে, কেমন?

রাজকুমার, আপনি আমাকে পাশে নিয়ে কাজ করতে চান এ আমার কত গর্ব কত বড় পাওয়া তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। সৌরজগৎ আমাকে মুগ্ধ করেছে, আমি অভিভূত হয়েছি তবু বড় একা নিঃসঙ্গ মনে হয়।

বনহুর বলে—দিপালী, আমি আছি তোমার পাশে।

বনহুরের কথায় দীপ্ত হয়ে উঠে দিপালীর মুখমণ্ডল।

❑

মরিয়ম বেগম জায়নামায ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আজ তাঁর দু'চোখে আনন্দদ্যুতি খেলে যাচ্ছে। নূর আজ ফিরে আসছে দেশের মাটিতে। দীর্ঘ কয়েক বছর পর সে দেশে ফিরে আসছে—এটা কম আনন্দের কথা নয়!

শুধু মরিয়ম বেগমের চোখেমুখে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাচ্ছে না চৌধুরীবাড়ির সবার মনেই আনন্দ উৎসব বয়ে চলেছে। সকলের মুখেই খুশির আভাস, এমন কি বাড়ির চাকরবাকর সবার মনেই খুশির লহরী খেলে যাচ্ছে। ফিরে আসছেন তাদের ছোটবাবু।

সরকার সাহেব আজ জীবনসীমার শেষ ধাপে দাঁড়িয়েও আনন্দে আত্নহারা। তাঁদের ছোট সাহেবের একমাত্র সন্তান ছোটবাবু। অবশ্য অনেকেই নূরকে ছোট সাহেব বলে কিন্তু সরকার সাহেব তা মেনে নেন না, তিনি নূরকে ছোটবাবু বলেই ডাকেন এবং সবাইকে বিশেষ করে বাড়ির চাকরবাকরদের ছোটবাবু বলে নূরকে ডাকার জন্য শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছেন।

সরকার সাহেব গোটা বাড়িটাকে নতুন সাজে সাজিয়েছেন, আলোয় ঝলমল করছে গোটা বাড়িটা।

শুধু চৌধুরীবাড়ি নয়, সমস্ত শহরে মিঃ জামান বিদেশ থেকে ফিরে আসা ব্যাপার নিয়ে মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে।

পুলিশমহলের সতর্কতা মিঃ জামান যেন টের না পায় বা বুঝতে না পারে দস্যু বনহুর তার কে বা কি সম্পর্ক মিঃ জামানের সঙ্গে। পুলিশমহলের সতর্কতার পেছনে রয়েছে বিরাট উদ্দেশ্য। যে উদ্দেশ্য সকলকামের জন্য পুলিশমহলের এত প্রচেষ্টা, সে প্রচেষ্টা যেন বানচাল হয়ে না যায় কোনোমতেই।

পুলিশপ্রধান মিঃ লিকো এখন কান্দাই পুলিশ সুপার। তিনি দীর্ঘকাল বিদেশে ছিলেন এবং বিদেশ থেকে ফিরে এসেই তিনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য নিজে ইচ্ছা করে কান্দাই শহরে এসেছেন। মিঃ লিকো মনে করেন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে তিনি সফলকাম হবেন।

মিঃ জাফরী এককালে তাঁর বন্ধুলোক ছিলেন। এক সময় হিন্দোলে তাঁরা উভয়ে একই সঙ্গে কাজ করেছেন। মিঃ জাফরী এখন বনহুরকে গ্রেপ্তারে উৎসাহী নন, এ কথা জানার পর তিনি এ দায়িত্বভার গ্রহণ করে কান্দাই এসেছেন।

মিঃ নূরুজ্জামান দেশে ফিরে আসছেন গোয়েন্দা বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করে! এত অল্প বয়সে কেউ এত বড় ডিগ্রি লাভে সক্ষম হয় নি, তাই পুলিশমহল বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগ নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছেন।

পুলিশমহল যেমন জেনেও তারা মিঃ জ্যামানকে জানতে বা বুঝতে দিতে রাজি নন, তেমনি সরকার সাহেব এবং মরিয়ম বেগম ও মনিরা তাদের সন্তান নূরকে তার পিতার আসল পরিচয় জানাতে চান না। চৌধুরীবাড়ির সরকার সাহেব, মরিয়ম বেগম আর মনিরা ছাড়া কেউ জানে না যে, এই বাড়িরই সন্তান স্বয়ং দস্যু বনহুর।

চাকরবাকরের মধ্যে শুধু জানে মকবুল। সে পুরানো চাকর, যেমন মহৎ তেমনি বিশ্বাসী, কাজেই তার তরফ থেকে তেমন কোনো সন্দেহ নেই।

সরকার সাহেব তবুও ভালভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কোনোক্রমে নূর যেন জানতে বা বুঝতে না পারে দস্যু বনহুর চৌধুরী বাড়িরই সন্তান।

সত্যই নূর ফিরে এলো একদিন স্বনামধন্য ডিটেকটির্ভ হয়ে নিজের দেশ কান্দাই শহরে।

মরিয়ম বেগম আর মনিরা বিপুল আগ্রহ নিয়ে এতদিন প্রতীক্ষা করছিলো। যেখানেই থাক মনির জানতে পারবে এবং সে নিশ্চয়ই হাজির হবে চৌধুরীবাড়িতে। কিন্তু সে আশা বিফল হলো, মরিয়ম বেগম এবং মনিরা হতাশ হয়ে পড়লেন।

সরকার সাহেবও অনেক উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন মনির আসবেই আসবে কিন্তু এই এলো সে! গভীর আনন্দের মধ্যেও একটা নীরব ব্যথা চৌধুরীবাড়ির কয়েকজনকে ব্যথিত করে তুলেছিলো সবার অজ্ঞাতে।

নুর বিমানবন্দরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশমহল তাকে ফুলের মালায় মালায় ভরিয়ে দিলো। সবাই এই তরুণ ডিটেকটিভকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে অন্তরের শুভেচ্ছা দিয়ে।

নূর বিমান থেকে অবতরণ করার পর পরই খুঁজে ফিরতে লাগলো তার আপনজনদের। কোথায় তার দাদু সরকার সাহেব, কোথায় দাদীআম্মা মরিয়ম বেগম, কোথায় স্নেহময়ী জননী মনিরা আর কোথায় তার পিতা মনির চৌধুরী। পুলিশমহলের বেষ্টনী ভেদ করে নূর এগিয়ে আসছে আত্মীয়স্বজনের দিকে।

মনিরার দু'চোখ ছাপিয়ে পানি আসছিলো। পুলিশমহল যখন তার সন্তানকে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত তখন বারবার মনে পড়ছে স্বামীর কথা, স্বামীর মুখখানাই ভেসে উঠছে তার চোখের সামনে। অতি কষ্টে সে নিজকে সংযত করে রেখেছে।

মরিয়ম বেগমও তাকিয়ে আছেন কখন আসবে নূর তার পাশে। চোখেমুখে তার খুশির উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ছে।

সরকার সাহেবও দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এলেই তিনি নূরকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন, একটা দীপ্ত ভাব সরকার সাহেবের ঘোলাটে চোখকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

নূর তার পরম শ্রদ্ধার সরকার সাহেবকে দেখামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর বুকে। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললো—দাদু, ভাল আছো তো?

ভাল আছি দাদু, তুমি ভাল ছিলে?

তোমাদের দোয়ায় ভালো না থেকে পারি?

পাশেই মনিরা দাঁড়িয়ে, নূরের কণ্ঠ সে কত দিন পর শুনতে পেলো—একি, এ যে তার স্বামী মনিরের কণ্ঠস্বর! সেই পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠ, যা সে কোনো কণ্ঠে খুঁজে পায় না।

নূর এবার দাদীর কদমবুসি করে মায়ের কদমবুসি করতে যায়।

কেমন আছো আম্মি?

মনিরা কোনো জবাব দিতে পারে না, দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রু নেমে আসে তার।

মরিয়ম বেগম নূরকে বুকে আঁকড়ে ধরে বলেন—দাদু! আমার সোনাদাদু, আমরা সবাই ভাল ছিলাম। তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি যে মরতেও পারিনি দাদু।

নূরকে নিয়ে ফিরে এলো মনিরা, মরিয়ম বেগম এবং সরকার সাহেব।

চৌধুরীবাড়িতে আনন্দ উৎসব বয়ে চললো।

বাসায় ফিরেই নূর অভিমানভরা কণ্ঠে বললো—আম্মি, আব্বুকে দেখছিনা কেন?

এবারও নীরব মনিরা।

জবাব দিলেন মরিয়ম বেগম—ওর কথা বলিস্ নে দাদু।

কেন? কেন বলবোনা? আব্বুকে আমি বিদায় মুহূর্তেও পাইনি, আজ জন্মভূমিতে ফিরে এসেও আব্বুকে দেখতে পাচ্ছি না......বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে নূরের কণ্ঠস্বর।

মনিরার গন্ড বেড়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু, তাড়া তাড়ি সে আঁচলে চোখের পানি মুছে ফেলার চেষ্টা করে।

কিন্তু নূরের দৃষ্টি এড়ায় না, সে মায়ের চোখে পানি দেখে, ব্যথিত হয়। বলে নূর—আম্মি, বলো আব্বু কোথায় আছে? আমি যাবো এবং তাঁকে নিয়ে আসবো।

মরিয়ম বেগম বলেন—সবে তো এলি দাদু, সময় হলে ঠিক সে এসে পড়বে। সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকে সে, তাইতো আসতে পারে না ইচ্ছা থাকলেও।

এমন সময় বাইরে মোটরের হর্ণ বেজে উঠলো।

একটু পরে এসে জানালো মকবুল—একজন ভদ্রলোক এসেছেন, তার সঙ্গে দু'জন খাকি পোশাকধারী পুলিশ রয়েছে এবং তাদের হাতে রয়েছে রাইফেল।

মকবুলের বলার ধরণ দেখে হাসি পেলো সবার।

সরকার সাহেব ছড়ি হাতে নেমে গেলেন নিচে বৈঠকখানায়, অল্পক্ষণেই ফিরে এলেন তিনি। হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন—পুলিশপ্রধান মিঃ লিকো এসেছেন দাদুর সঙ্গে দেখা করতে। জরুরি কথা আছে নাকি।

নূর হেসে বললো—এখুনি আসছি আম্মু। দাদী আম্মু, তোমরা বসো, এখুনি আসবো।

নূর নেমে গেলো নিচে!

কিছু সময় পর সে ফিরে এলো, তার হাতে একখানা চিঠি।

সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলো, নূর হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তকণ্ঠে বললো—আম্মি, মিঃ লিকো এসেছেন আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে। পুলিশমহলের ইচ্ছা আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের দায়িত্বভার গ্রহণ করি।

একসঙ্গে চমকে উঠলেন সরকার সাহেব, মরিয়ম বেগম এবং মনিরা। তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলেন। মনিরার মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে উঠলো।

মরিয়ম বেগম ঢোক গিললেন।

সরকার সাহেব বললেন—এইতো সবে এলে, দু'চার দিন বিশ্রাম না করেই কাজে যোগ দেওয়াটা.......

ও কিছু নয় দাদু। বরং কাজ না পেলেই হাঁপিয়ে উঠবো। আচ্ছা আম্মু, তুমি আর দাদীআম্মি আমার কথা শুনে মানে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের দায়িত্বভার গ্রহণ করবার কথা শুনে অমন চমকে উঠলে কেন? ও বুঝতে পেরেছি, তোমরা ভয় পাচ্ছো কিন্তু জেনে রেখো দাদী আম্মা, আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবোই!

মনিরা গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো—নূর, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে তোর এত আগ্রহ কেন বল্‌তো? এ ছাড়া কি আর কোনো চিন্তা তোর মাথায় আসেনা?

আম্মু, তুমি তো জানো দস্যু বনহুর কান্দাই শহরের কতবড় আতঙ্ক। তার ভয়ে সমস্ত দেশবাসী সন্ত্রস্ত। তাছাড়া সে পুলিশ মহলকে যেভাবে

নাকানি চুবানি খাইয়েছে তাতে মনে হয় তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া তার...

নূর! ...মনিরা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো।

মরিয়ম বেগম বললেন—দাদুমনি, বনহুর তো তোর কোনো ক্ষতি করেনি। কেন তুই তার প্রতি এত ক্ষুব্ধ হয়েছিস বল্তো?

ক্ষুব্ধ হবো কেন দাদীআম্মা, কর্তব্য পালনে উৎসাহী বলতে পারো। দস্যু বনহুর আমার ক্ষতি না করলেও সে দেশবাসীর সর্বনাশ করে অহরহ। যাক্ ও সব কথা, ফিরে যখন এসেছি তখন কাজে নামতেই হবে। একটু পায়চারী করে নিলো নূর আপন মনে, তারপর বললো —দস্যু বনহুরের উৎপাত এখনও কি সমানভাবে চলেছে সরকার দাদু?

না, অনেক দিন হলো তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না— বললেন সরকার সাহেব।

নূর বললো—তাহলে কি সে উধাও হয়েছে।

সরকার সাহেব এবং মরিয়ম বেগম নিশ্চুপ রইলেন,—

মনিরা কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলো।

নূর বললো—আম্মি চলে গেলো। একটু হাসলো নূর। হেসে বললো—আম্মি, আমার উপর অভিমান করেছেন বুঝি......

সরকার সাহেব কথাটার মোড় পাল্টিয়ে অন্য কথা তুললেন। বললেন—পুলিশপ্রধান কি হলঘরে অপেক্ষা করছেন? যদিও সরকার সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা চলে গেছেন তবু তিনি কথাটা বললেন।

নূর বললেন—না, তাঁরা তখনি চলে গেছেন। অবশ্য আমি তাঁদেরকে বসবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। এবার শুরু হয় নানা কথাবার্তা।

বিদেশে থাকাকালে নূর কেমন ছিলো, কেমন লাগতো তার। কে কিভাবে তাকে সহায়তা করেছে, অনেক কথা।

ইতিমধ্যে মনিরা নানাবিধ খাদ্যসম্ভার নিয়ে হাজির হলো সেখানে।

নূর বলে উঠলো—আম্মি, তাইতো তুমি পালিয়েছিলে। সত্য দাদু, আম্মির হাতে খাবার কত দিন পেটে পড়েনি। নূর খেতে শুরু করে দেয়।

পরিবেশন করে মনিরা।

কাজে যোগদান করবার পূর্বে কয়েকদিন নূর নিজ বাড়িতে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। বন্ধুবান্ধব নিয়ে মেতে রইলো সে মনের আনন্দে। মনিরা পুত্রকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি হয়েছে সত্য কিন্তু একটা ব্যথা তার মনে সর্বক্ষণ খচ্‌খচ্ করছে। সে হলো স্বামীর বিরহ বেদনা।

আজ কতদিন পর একমাত্র সন্তান ফিরে এসেছে নিজ দেশে, অথচ সে তার পিতাকে খুঁজে পেলো না, একটি বার দেখতেও পেলো না সে তাকে। নূর কি ভাবছে, না জানি কত কথা মনে হচ্ছে তার। কিন্তু কে দেবে জবাব?

মনিরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে কত কথা।

হঠাৎ কানে ভেসে এলো পাশের কক্ষ থেকে নূর আর মরিয়ম বেগমের কথার আওয়াজ।

নূর বলছে—দাদী আম্মা, জায়নামাজ ছেড়ে শয্যা গ্রহণ করেছো দেখছি।

বস্ দাদু, আমার কাছে বস্।

এই নাও বসলাম। দাদী আম্মা, তোমাদের ছেড়ে কি যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম!

সত্য দাদু, মনে পড়তো আমাদের কথা? ওখানে কত সুন্দর মানুষ, কত সুন্দর বাড়িঘর রাস্তা-ঘাট—সবকিছু অদ্ভুত সুন্দর......

কিন্তু আমার নিজের দেশের মত নয় দাদীআম্মা। সব সুন্দর, ভাল বটে কিন্তু আমার মন যা চায় তার মত নয়।

নূর!

দাদীআম্মা, ক'দিন তো কেটে গেলো, এবার ডাক এসেছে—তোমাদের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে যেতে হবে।

কথাটা মনিরার কানে যেতেই বুকটা ধক্ করে উঠলো। ভাবলো নূর আবার তাদের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে চলে যাবে। স্বামীকে সে পেয়েছি কিন্তু নিবিড় করে নিশ্চিন্তভাবে পায় নি কোনোদিন। যতটুকু সময় পেয়েছে ততটুকু সময় হারানোর উদ্বিগ্নতা নিয়ে কেটেছে তার। কোনোদিন সে নিশ্চিন্ত মনে তাকে পাশে পায় নি, একটা গভীর দুশ্চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে মনটাকে। অতৃপ্ত হৃদয় মনিরার। স্বামীর সোহাগ সে অনেক পেয়েছে কিন্তু......মনিরার ভাবনায় বাধা পড়লো, কানে ভেসে এলো মামীমার কণ্ঠস্বর—তোকে আর যেতে দেবো না নূর। তুই জানিস্ নে তোকে বিদেশে পাঠিয়ে তোর মা অবিরত চোখের পানি ফেলেছে। এত কচি বয়সে কোনো মা তার সন্তানকে বিদেশ পাঠায় বল্তো?

নূরের গলার স্বর—জানি দাদীআম্মা, আমি সব জানি। আমাকে দূরে পাঠিয়ে আম্মি কত দুঃখ কত ব্যথা পেয়েছেন আমি জানি। তাইতো চাই আম্মির সন্তানের মত তাঁর যোগ্যতা রাখতে। দোয়া করো দাদীআম্মা, যেন কৃতকার্য হই।

দোয়া করি নূর, তুই যেন নূরের মতই পৃথিবীর বুকে নিজের আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হোস্।

দাদীআম্মা!

ভাই, মাকে ব্যথা দিসনে, এই হলো আমার কথা।

তোমার কথা আমার শিরোধার্য। আচ্ছা দাদীআম্মা, আব্বু কোথায় থাকেন, কি করেন, আজও তোমরা আমাকে জানালে না? আমি জানি আব্বুর অভাবটাই আম্মিকে সর্বক্ষণ ব্যথাকাতর করে রাখে কিন্তু কেন—কেন আব্বু আম্মিকে এভাবে ব্যথা দেয়...

সে কথা আমি জানি না নূর, কেন সে তোর আম্মিকে এভাবে ব্যথায় জর্জরিত করে। বড় নিষ্ঠুর সে......

না দাদীআম্মা, আব্বু মোটেই নিষ্ঠুর নন। তিনি দেবপুরুষ...

পাশের ঘরে মনিরার অশ্রু বাধা মানে না, তার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। পিতার প্রতি সন্তানের অপরিসীম শ্রদ্ধা বড় অপরূপ। ভাবে মনিরা—নূরের চিন্তা অহেতুক নয়, সত্যিই তার আব্বু দেবপুরুষ......

নূর তখনও বলে চলেছে—কতদেশ ঘুরে এলাম কিন্তু আব্বুর মত পুরুষ আমার চোখে পড়েনি। দাদীআম্মা, তুমি বিশ্বাস করো তাঁর মত পিতার সন্তান আমি, সেটাই আমার গর্ব, আমার আনন্দ কিন্তু জানি না আব্বু কেন আমাদের ছেড়ে থাকতে ভালবাসেন!

মনিরা আপন মনে বলে উঠে—কেন, কেন আমাদের ছেড়ে থাকতে ভালবাসেন, এর জবাব তুই কোনোদিন পাবি না নূর, কোনোদিন পাবি না......বালিশ সিক্ত হয়ে উঠেছে মনিরার অশ্রু ধারায় কিছুতেই সে মনকে প্রবোধ দিতে পারে না। আজ তার বড়আনন্দের দিন, বড় খুশির মুহূর্ত অথচ বুকভরা ব্যথা তাকে জর্জরিত করে তুলছে। পৃথিবীতে আর দশজন, নারীর মত সেও স্বামীর সংসার সন্তান নিয়ে সুখী জীবন কাটাতে চেয়েছিলো কিন্তু সে তা পায় নি। তার মত স্বামী ক'জন নারীর ভাগ্যে জোটে, তার মত সন্তান ক'জন জননী পায়। তবু মনিরার বুকে কেন এত ব্যথা কেন এত দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু কে দেবে তার জবাব।

নূর কখন যে তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি মনিরা।

নূর ডাক দেয়—আম্মি!

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে আঁচলে চোখ মুছে ফেলে মনিরা।

নূর বুঝতে পারে তার আম্মি নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছিলেন, সে বিস্ময় প্রকাশ না করে শান্তকণ্ঠে বললো—আম্মি, তুমি কাঁদছিলে?

কই না তো?

নূর মায়ের বিছানার একপাশে বসে পড়লো তারপর কিছুটা ঝুঁকে বললো—আম্মিজান আমি ফিরে এসেছি তবু তোমার চোখে পানি? তুমি যেদিন আমাকে বিদায় দিয়েছিলে সেদিনও আমি দেখেছি তোমার অশ্রুসিক্ত মুখ। আমি বিদেশ গিয়ে পড়াশোনার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম কিন্তু সব সময় তোমার অশ্রুসিক্ত মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো। আম্মি, আমি চাই তোমার মুখে সব সময় হাসি ফুটে থাকবে, তোমার হাসিভরা মুখ আমাকে যোগাবে কাজের প্রেরণা।

বাবা নূর!

বলো আম্মি!

আমার চোখে পানি ও কিছু নয়। ওটা আনন্দ অশ্রু, কতদিন পর ফিরে এসেছিস্, সত্যি আমার বড় আনন্দ হচ্ছে........

আম্মি, দোয়া করো এ আনন্দ যেন তোমার সার্থক হয়।

দোয়া করি বাবা, আমি দোয়া করি তোর বাসনা সার্থক হোক......কথাটা শেষ করেই চমকে উঠলো মনিরা, নূরের বাসনা সে জানে কি সে চায়।

আনমনা হয়ে যায় মনিরা।

নূর মাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে—আম্মি, তুমি এবার ঘুমাও।

হাঁ বাবা, আমি ঘুমাবো, তুই যা! ঘুমাবি যা!

নূর মা'র দেহে চাদর টেনে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মনিরার দু'চোখ ছাপিয়ে হু হু করে নেমে আসে অশ্রুবন্যা। বালিশ সিক্ত হয়ে উঠে তার চোখের পানিতে। আজ বারবার মনে পড়ছে স্বামীর কথা, তার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি বাজছে কানের কাছে। কতদিন হলো সে আসে না, না জানি কোথায় আছে সে, কেমন আছে।

❑

কোনোদিন কি ভেবেছিলাম সৌরজগতে এসে এমনিভাবে দিনের পর দিন কাটাতে হবে। পৃথিবীর বুক ছাড়াও যে কোনো গ্রহে এমন মানুষ বসবাস করছে এটা আমাদের ধারণার মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিলো এতদিন,

এখন তা স্পষ্ট হলো এবং জানতে পারলাম। শুধু যে মানুষই বসবাস করছে তা নয়, সৌরজগতের কোন্ গ্রহ এটা যদিও সঠিক জানি না তবে যতদূর মনে হয় মঙ্গল গ্রহে আমরা এখন অবস্থান করছি। এখানে মানুষ ছাড়াও রয়েছে বৃক্ষলতাগুল্ম আরও জীবজন্তু নজরে পড়েনি তবে আছে কিনা তাও জানতে পারিনি। আমার মনে হয় জীবজন্তু এখানে নেই, আলো বাতাস আছে তাও ঠিক পৃথিবীর আলো বাতাসের মত নয়। এখানে আলোর তীব্রতা নেই, আছে এক অদ্ভুত স্নিগ্ধতা!

হাঁ, ঠিক বলেছেন রাজকুমার, পৃথিবীর আলোকরশ্মির মধ্যে যে উগ্রতা আছে এখানে তা নেই। বনহুরের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো দিপালী!

বনহুর বসে বলেছে—এখানে যে আলোকরশ্মি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সূর্যের কিরণ বা রশ্মির তাপ নয়, এটা চন্দ্রপৃষ্ঠের আলোর ছটার স্নিগ্ধতা। এখানে বৃক্ষলতাগুল্মগুলোর রং তাই সবুজ নয়—ফিকে বেগুনি, এমন কি ফলগুলোও তাই বেগুনি রঙের। আলোবাতাসে এমন একটা শক্তির প্রভাব রয়েছে যার জন্য এ রাজ্যের মানুষ সহজে বুড়ো হয় না। আমি আরও জানতে পেরেছি, এখানে এক এক জনের বয়স একশত থেকে তিন শত বছর। তার বেশিও আছে কারো কারো বয়স। দিপালী, আমার কিন্তু বেশ লাগছে। এখানে নেই কোনো হিংসা-বিদ্বেষ—নেই কোনো রোগ শোক জরা ব্যাধি, নেই কোনো রাহাজানি চুরি ডাকাতি—সত্যি বড় মনোরম স্থান এই সৌরজগৎ।

দিপালী বলে উঠলো—রাজকুমার, আপনার যদি ভাল লেগে থাকে, তাহলে আমারও লাগছে কিন্তু...

বলো, থামলে কেন?

পৃথিবীর আলো-বাতাসে মানুষ আমরা, যত ভালই লাগুক তবু মন যেন কেমন উদাস হয়ে উঠে মাঝে মাঝে।

হাঁ, সে কথা সত্য দিপালী, মাঝে মাঝে মনে হয় এই মুহূর্তে যদি পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতে পারতাম!

তাহলে কি কোনোদিন আমরা পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতে পারবো না রাজকুমার? দিপালীর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ব্যথাকাতর মনে হলো।

বললো বনহুর—হতাশ হইনি দিপালী, আশা আছে হয়তো এমন এক মুহূর্ত আসবে যখন আমরা স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতে পারবো।

তাহলে কি আমরা সঠিক নিশ্চিন্ত নই এ ব্যাপারে?

সঠিক জবাব আমিও তোমাকে দিতে পারছি না দিপালী। একটু থেমে বললো বনহুর—এসেছি যখন বা আসবার সৌভাগ্য যখন হয়েছে তখন এই অদ্ভুত দেশ বা রাজ্যটা একবার ভালভাবে দেখে যেতে চাই। আমাদের এই আবিষ্কার হবে পৃথিবীর বুকে এক নতুন সৃষ্টি। যেমন পৃথিবীর মানুষই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে চাঁদের দেশ। চাঁদের পৃষ্ঠে পৃথিবীর মানুষ অবতরণ করেছে এবং নতুন এক সৃষ্টি তারা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি আমরা কালচক্রে এই অদ্ভুত দেশে সৌরজগতে কোনো এক গ্রহে এসে পৌঁছেছি কাজেই যদি কোনোদিন পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতে সক্ষম হই তাহলে আমাদের আবিষ্কার হবে পৃথিবীর এক বৃহত্তম আবিষ্কার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দিপালী, আমরা যতদূর দেখেছি অনেক কিছু জানতে পেরেছি, আরও জানার বাসনা আছে। পৃথিবীর মত বৃহদাকার না হলেও এই গ্রহটা ছোটখাটো নয়। আমাদের এখনও অনেক কিছু জানবার আছে, দেখবার আছে, আবিষ্কার করবার আছে।

দিপালী এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো বনহুরের কথাগুলো, সত্যি তারা হঠাৎ ঘটনাচক্রে যে রাজ্যে এসে পৌঁছে গেছে, তা বড় বিস্ময়কর স্থান, কাজেই এ রাজ্যটা ভালভাবে তাদের দেখা দরকার। তারা যতটুকু দেখেছে তা অতি সামান্য, আরও অনেক কিছু জানার বা দেখার রয়েছে তাদের।

দিপালী আর বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

তারা পথ চলতে শুরু করলো। সুন্দর প্রশস্ত পথ কিন্তু কোনো যানবাহন নেই! পথের ধার দিয়ে যেমন বৃক্ষালতাপাতাগুল্ম থাকে তেমনি রয়েছে ছোটখাটো মাটি জাতীয় পদার্থের টিলা। গুড়ো গুড়ো তুষার দিয়ে আবৃত টিলাগুলো। উজ্জ্বল আলোর ছটাতে ঝলমল করছে, যেন মনিমাণিক্য জ্বলছে। কচিৎ দু' একটা যান দেখা যায় যা পৃথিবীর মানুষের তৈরি রথের মত দেখতে অথচ মানুষই তা বহন করে চলেছে।

দিপালী আর বনহুর বেশ বুঝতে পারে জীবজন্তু না থাকায় এরা মনুষ্যবহন উপযোগী বাহন তৈরি করে নিয়েছে। তাও প্রচুর নয়, কদাচিৎ দু' একটা মাত্র।

বনহুর আর দিপালী চলেছে।

যখন ক্ষুধা অনুভব হচ্ছে কোনো গাছ থেকে ফল ছিড়ে নিয়ে পেট পুরে খাচ্ছে তারা। ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য এখানে কাউকে ভাবতে হয় না। প্রচুর গাছ

রয়েছে ফলফুলে ভরা গাছগুলো। যার যত খুশি খেতে পারে এখন আর কেউ বাধা দেয় না বা আপত্তি করতে এগিয়ে আসে না।

তাই বলে কেউ প্রয়োজনের বেশি একটা ফলও ছিড়ে নষ্ট করে না। পথ চলে এরা শৃঙ্খলার সঙ্গে, কথা বলে শান্ত আর মিষ্টি স্বরে। সুরের মাধুর্য যেন ঝরে পড়ে প্রতিটি নারীপুরুষের কণ্ঠে।

অবশ্য নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা নিতান্ত কম।

এখানে নারীরাই বেশি কাজ করে। পুরুষদের কঠিন কাজ ছাড়া হাল্‌কা কাজে বড় একটা দেখা যায় না। তবে এটা বেশ বোঝা যায়, পুরুষ রমণী উভয়েই উভয় জাতিকে খুব বেশি সমীহ করে চলে।

কোনো কোনো জায়গায় নারীপুরুষকে মিলিতভাবেও কাজ করতে দেখেছে তারা। একাগ্রতা নিয়ে ওরা কাজ করে, কোনো প্রতিবাদ করে না কেউ কারও কাজে। তাতে বোঝা যায়, কেউ অন্যায় করে না যা তাদের করণীয় যা নিয়ম তাই তারা করে। সব কাজের মধ্যেই রয়েছে একটা শান্ত পরিবেশ।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে তাদের এই বিস্ময়কর অদ্ভুত রাজ্যে। যে তরুণী দল বনহুরকে আবিস্কার করেছিলো তারা তাকে নিয়ে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলো, কারণ নতুন ধরনের মানুষকে তারা পেয়েছিলো নিজেদের মধ্যে।

হয়তো বনহুরকে ওরা দেবদূত মনে করেছিলো।

সবাই নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বনহুরের চারপাশ ঘিরে তাকে স্বাগতম জানাতে ব্যস্ত ছিলো। কেউ যেন তাকে দূরে সরাতে চায় না।

মাঝে মাঝে তরুণী দলের নির্দেশে আসে মধুময় সুধা, যে সুধা পান করে বনহুর ভুলে যায় তার সবকিছু। নতুন এক জগতে নতুন এক আবেশে আত্মহারা হয়ে পড়ে সে।

তারপর যখন তার সংজ্ঞা ফিরে এলো দেখলো তার চারপাশে ঘিরে আছে অনেকগুলো তরুণী, সবাই নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট কিন্তু সবাই জ্ঞানহীন বা নিদ্রামগ্ন তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো পড়ে আছে তাদের পাশে, কারো বা কোলের উপরে।

অপরূপ! বনহুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে শব্দটা। সে আত্মহারা হয়ে যায়, নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। হঠাৎ মনে পড়ে এখন সে সম্পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে। মনে পড়ে দিপালীর কথা, চারপাশে তাকিয়ে দেখে ঘুমন্ত তরুণী দল ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে।

না জানি দিপালী কোথায় এবং সে কেমন আছে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর বেরিয়ে আসে বাইরে। তারপর সে চলতে থাকে আপন মনে কিন্তু দৃষ্টি তার সন্ধান করে ফেলে দিপালীকে।

যেমন করে হোক দিপালীকে খুঁজে বের করতেই হবে।

পথ চলেছে।

চার পাশের দৃশ্য তাকে অভিভূত করে ফেলেছিলো, সে ঐ সব মনোরম দৃশ্য দেখছিলো আর এগুচ্ছিলো, হঠাৎ তার কানে ভেসে আসে সেই অদ্ভুত শব্দ।

তারপর সে অদ্ভুত যান।

কচ্ছপ আকার যানটি তাকে শুধু আশ্চর্যই করে না, তার মনে আশার প্রদীপ জ্বেলে দেয়।

একটি পথের সন্ধান পায় সে।

হয়তো কোনো দিন পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতে পারবে, এই আশা উঁকি দেয় হৃদয়ের মধ্যে।

হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে দিপালীর সাক্ষাৎ ঘটে যায়।

আনন্দে দিশেহারা হলেও নিজকে বনহুর সংযত করে রাখে। দিপালীকে পাশে পেয়ে বনহুরের মনে হয়, সে যেন তার কত আপনজন। কতদিন পর একেবারে স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে পেয়েছে এবং নিজকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে বনহুর।

দিপালী আর বনহুর পাশাপাশি এগুচ্ছিলো।

যখনই পথে কোনো তরুণীদল বা কোনো যানবাহন দেখা যাচ্ছিলো তখনই তারা পাশের ঝোপঝাড় বা টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়ছিলো।

যেন তাদেরকে কেউ দেখে না ফেলে।

সত্য আজ দিপালীর মনে অপরিসীম আনন্দ হচ্ছে। সে ভেবেছিলো কোনোদিন আর তার রাজকুমারকে পাশে ফিরে পাবে না। যে তরুণীদল রাজকুমারকে ঘিরে রেখেছিলো তাদের কাছ থেকে রাজকুমারকে কেড়ে নেবার মত শক্তিও ছিলো না দিপালীর।

তাই দিপালী এত মনোরম রাজ্যে অবস্থান করেও শান্তি পাচ্ছিলো না।

রাজকুমার তার পাশে, এ যেন তার পরম আনন্দ।

দিপালী আর বনহুর আপন মনে অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এগুচ্ছিলো।

হঠাৎ তাদের দৃষ্টি চলে যায় সম্মুখে।

বিস্ময়ে থ' মেরে যায় তারা দু'জন।

একটি বিরাট রাজপ্রাসাদ।

প্রাসাদটি যেন শুধু মনিমাণিক্য আর হীরা-জহরৎ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। দূর থেকে তারা ছোট্ট আকারে দেখতে পাচ্ছে তবু বেশ বুঝতে পারছে প্রাসাদটি ছোট নয়—বিরাট আকার হবে। আলোকরশ্মির ছটায় ঝলমল করছে, মনে হচ্ছে প্রাসাদটির গায়ে অসংখ্য তারার মালা জ্বলছে।

দিপালী আর বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল, তারা এমন প্রাসাদ কোনোদিন দেখেনি। দিপালী বললো—এমন প্রাসাদ কোনদিন দেখেনি। দিপালী বললো—আশ্চর্য বটে!

বনহুর বলে উঠলো—দিপালী, জানি না ঐ প্রাসাদটি কিসের তৈরি আর ওর মধ্যে কি ই বা আছে......

দিপালী বলে—আমারও বড় জানতে ইচ্ছে হচ্ছে প্রসাদটির ভিতরে কে বা কারা আছে, ওর ভিতরটা কেমন?

বনহুর বললো—চলো যা ভাগ্যে আছে ঘটবে তবু সৌরজগতের এই গ্রহের সব রহস্য আমরা উদঘাটন করবো।

চলুন রাজকুমার!

পা বাড়ালো ওরা দু'জন সামনের দিকে।

সেই মুহূর্তে পায়ের দিকে তাকিয়ে দিপালী আনন্দধ্বনি করে উঠলো—এসব কি দেখছি......

বনহুরের দৃষ্টিও পায়ের দিকে পড়লো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর।

পরবর্তী বই

মঙ্গল গ্রহের রহস্য